রেডিও
বিশারদ
জ্যোতির্ময় দে

রেডিও বিশারদ

জ্যোতির্ময় দে

॥ **আমরাও হতে পারি :** গ্রন্থমালা ছেলেমেয়েদের নানান শিল্পের টেকনিসিয়ান হয়ে ওঠার ইচ্ছাকে আরও উৎসাহ দেবে। এই গ্রন্থমালায় পর পর বেরিয়েছে ॥ বিদ্যুৎ-বিশারদ ॥ মোটর এঞ্জিনিয়ার ॥ রেডিও বিশারদ ॥ বিমান-বিশারদ ॥ মুদ্রণ-বিশারদ ॥ বীক্ষণ-বিশারদ ॥ ইত্যাদি ইত্যাদি ॥

• আমরাও হতে পারি •

ষষ্ঠ বই

জ্যোতির্ময় দে

• রেডিও বিশারদ •

ওরিয়েণ্ট

৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : আগস্ট ১৯৫৮

প্রকাশক প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক, ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি,
৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২ ॥ মুদ্রাকর ধনঞ্জয় প্রামাণিক.
সাধারণ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৫এ, ক্ষুদিরাম বসু রোড,
কলকাতা ৬ ॥ বাঁধাই ওরিয়েণ্টেল বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

দাম : আড়াই টাকা

প্রচ্ছদপট : খালেদ চৌধুরী
ভিতরের ছবি : পরেশ দাস
সুভাষ দে

পরিচিতি

"আমরাও হতে পারি" সিরিজে শ্রীজ্যোতির্ময় দের লেখা "রেডিও বিশারদ" বইখানি পড়ে খুশী হয়েছি। এই সিরিজ যাঁরা প্রকাশ করছেন তাঁরা বাঙ্গালী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ। এই বিজ্ঞানের যুগে নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কারের ও তার বিবিধ নূতন প্রয়োগের কথা আপামর সাধারণ জানতে ইচ্ছুক। কিন্তু সাধারণের বোঝার উপযোগী বাঙ্গলা বইএর একান্ত অভাব। এই সিরিজ সেই অভাব কিছু পরিমাণে দূর করবে আশা করি।

"রেডিও বিশারদ" বইটিতে বেতারে সংবাদ আদান-প্রদানের কথা আলোচিত হয়েছে। বেতার ফলিত বিদ্যুত-বিজ্ঞানের শাখা বিশেষ। কিন্তু বেতার ও সেই সঙ্গে স-তার টেলিগ্রাফি, টেলিফোনির এত দিকে এত বিচিত্র ভাবে প্রয়োগ হয়েছে যে এগুলিকে এখন Tele-communication নাম দিয়ে এক নূতন স্বতন্ত্র কলা-বিজ্ঞানের কোঠায় ফেলা হয়। এই দুরূহ কলা-বিজ্ঞানের গোড়ার কথাগুলি লেখক খুব সরলভাবে, অনেক রকম উদাহরণের সাহায্যে সাধারণ পাঠককে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। আশা করি তাঁর উদ্যম সফল হবে ও বইটি সাধারণের কাছে সমাদর লাভ করবে। আমি বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

২০শে আগস্ট, ১৯৫৮
বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা

শিশিরকুমার মিত্র

১

সেকালের দূত আর একালের দূত

মনে কর, তুমি আর আমি অনেক আগের যুগের মানুষ। তুমি থাক দূরদেশে। আমার মনের কথাটা তোমাকে জানাতে চাই। কি করে পৌঁছে দেব সে কথা তোমার কাছে?

আমি যদি রাজা হ'তাম তাহ'লে ভাবনা ছিল না। আমার দূতেরা আমার চিঠি নিয়ে যেতো তোমার কাছে। কিন্তু আমি যদি রাজা না হ'তাম তখন তো আমার দূত থাকতো না। আমার মনের কথাটা মনেই থাকতো, তোমার কাছে আর পৌঁছে দিতে পারতাম না।

রাজা বাদশাদের দিনকাল ফুরিয়ে গেছে কিন্তু খবর পাঠানোর দূতের দরকার ফুরিয়ে যায় নি। খবর পাঠাতে হলেই চাই দূত।

আজকের দিনে মানুষের দখলে রয়েছে খবর পাঠানোর অনেক সরকারী বেসরকারী দূত।

আমি যদি তোমাকে চিঠি লিখে ডাকবাক্সে ফেলি সরকারী দূতেরা সে চিঠি তোমার কাছে পৌঁছে দেবে। কিন্তু আমার জরুরী খবরগুলি আরও তাড়াতাড়ি তোমার কাছে পৌঁছে দিতে পারি, টেলিগ্রাম বা টেলিফোনে। সেখানে বিদ্যুৎ আমার দূত। তারের ভিতর দিয়ে নিমেষের মধ্যে বিদ্যুৎ এখানকার খবর ওখানে পৌঁছে দেয়।

কিন্তু অনেক দূরে খবর পাঠাতে হ'লে আমি সব সময় টেলিগ্রাম বা টেলিফোনের উপর নির্ভর করতে পারি না। কয়েক হাজার মাইল ধরে টেলিগ্রাফ বা টেলিফোনের তার বসাতে হ'লে অনেক খরচ অনেক হাঙ্গামা। সে সব হাঙ্গামা পোয়াতে যদি আমি রাজীও থাকি তবুও সবসময় খবর পাঠাতে পারি না।

মনে কর আমি জাহাজের কাপ্তেন, মাঝ সমুদ্রে আমার জাহাজডুবি হচ্ছে। তখন আমি খবর পাঠাব কি করে? জাহাজের সাথে তো আর টেলিগ্রাফ টেলিফোনের তার বেঁধে দেওয়া চলে না। তখন আমার চাই এমন একটা দূত যার যেতে তারের দরকার হয় না, নিমেষের মধ্যে আমার বিপদের খবর জানিয়ে দেবে। তখন খবর পাঠাই যে দূতের মারফৎ তার নাম বিদ্যুতের ঢেউ বা বেতার; নিমেষের মধ্যে শূন্যের ভিতর দিয়ে এক জায়গার খবর অন্য জায়গায় পৌঁছে দিতে পারে।

আগের দিনে লোকেরা এসব দূতের খবর জানতো না। মানুষ অনেকদিন পরে এদের কথা জেনেছে। এদের বশ করতে অনেক সাধনার দরকার হয়েছে।

সব দূতেরই ক্ষমতা সমান নয়। চিঠিতে টেলিগ্রামে তোমাকে আমি গান গেয়ে শোনাতে পারি না। কিন্তু টেলিফোনে বা বেতারে আমার গান হাসি কান্না সব-কিছুই তোমাকে শোনাতে পারি,—যেন তুমি আমার কাছে বসে আছ।

তুমি যখন আমার সামনে বসে, তখনও আমার বলা কথা

তোমার কানে পৌঁছে দেবার জন্য একটা দূতের দরকার। আমি যদি বোবা না হই আর তুমি যদি কালা না হও তবে এমন একটা দূত সব সময় আমার বশে আছে। তাকে আমরা বলি শব্দের ঢেউ। শব্দের ঢেউয়ের মাধ্যম হ'ল বাতাস অর্থাৎ জলের ঢেউ যেমন হয় জলে, শব্দের ঢেউ তেমন হয় বাতাসে। ধর, আমি কথা বলতে পারি তুমিও কানে শুনতে পার। কিন্তু, মনে কর তোমার আমার মাঝখানে বাতাস নেই। তখন আমি শত চিৎকার করলেও আমার কোন কথাই তুমি শুনতে পাবে না।

এসো, এবার আমাদের তিনটে দূতের সঙ্গে একে একে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। এরা হ'ল—

- শব্দের ঢেউ
- তারের ভিতর-দিয়ে-যাওয়া বিদ্যুৎ
- শূন্যের ভিতর-দিয়ে-যাওয়া বিদ্যুতের ঢেউ

২

রকমারি ঢেউ

জলের ঢেউ দেখেছো ? পুকুরের জলে যদি ঢিল ফেল তবে তোমার ঢিলটা যেখানে পড়েছে সেখান থেকে চারদিকে জলের উপর ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ জলটা কোথাও উঁচু কোথাও নিচু হয়ে যায়। এখন যেখানে জল উঁচু হয়ে আছে কিছুক্ষণ পরে সেখানটা নিচু হয়ে যাবে; যেখানটা নিচু সেখানটা উঁচু হয়ে যাবে। এই উঁচু-নিচু হবার ব্যাপারটা, এই চারদিকে ছড়িয়ে পড়াটাকেই, বলে জলের ঢেউ। তোমার ফেলা ঢিল যদি বড় হয় তখন উঁচু-নিচু হবার মাত্রাটা হয় খুব বেশী। ঢিল ছোট হলে ঢেউয়ের উঁচু-নিচুর মাত্রা কম হয়।

লক্ষ্য করলে দেখবে ঢেউটা যতই দূরে যায় ততই ঢেউয়ের উঁচু-নিচু হবার মাত্রাটা কমে আসে, ঢেউ ক্রমেই মিলিয়ে যায়।

এক সেকেণ্ডে ঢেউয়ের চূড়ো যদি চার ফুট এগিয়ে যায় তখন আমরা বলি ঢেউয়ের গতিবেগ (Velocity) সেকেণ্ডে চার ফুট।

জলে ঢিল না ফেলেও ঢেউ সৃষ্টি করা যায়। জলে হাত ডুবিয়ে যদি খুব তাড়াতাড়ি হাত ওঠাও নামাও তবে দেখবে এতেও ঢেউ হয়।

জলের ঢেউ ছাড়া আরও অনেক রকম ঢেউ হয়। তাদের

প্রকৃতি জলের ঢেউ থেকে আলাদা। কিন্তু ঢেউ মাত্রেরই কতকগুলো গুণ রয়েছে—যা সব ঢেউয়ের বেলাতেই এক।

যেমন প্রত্যেকে ঢেউয়েরই 'তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য', 'কম্পন-সংখ্যা' ও 'গতিবেগ' রয়েছে। গতিবেগ কাকে বলে তোমাকে এইমাত্র বলেছি। এবার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আর কম্পন-সংখ্যার কথা বলছি।

জলের ঢেউয়ের তুটো পাশাপাশি চূড়োর জায়গার মধ্যের দূরত্বকে বলা হয় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (Wave-length)। জলে হাত ডুবিয়ে যখন ঢেউ সৃষ্টি কর, তখন হাতের পাতা প্রতি সেকেণ্ডে যতবার কাঁপাও সে সংখ্যাটাকে বলা হয় ঢেউয়ের কম্পন-সংখ্যা (Frequency)। একবার কাঁপুনিতে একটা একটা করে ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। সেকেণ্ডে যদি দশবার করে হাত কাঁপাও তবে দশটা ঢেউ সেকেণ্ডে সৃষ্টি হবে। কম্পন-সংখ্যা হবে দশ। পাশাপাশি মাথার দূরত্ব যদি হয় এক ফুট তবে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হবে এক ফুট।

(1নং ছবি দেখ)। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আর কম্পন-সংখ্যার গুণফল গতিবেগের সমান হয়। কম্পন-সংখ্যা = প্রতি সেকেণ্ডে 10 এবং তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য = 1 ফুট হ'লে এক সেকেণ্ডে যে 10 টি ঢেউ তৈরী হ'ল তার প্রথমটি ঢেউয়ের উৎস থেকে $10 \times 1 = 10$ ফুট দূরে রয়েছে। সুতরাং গতিবেগ = 10 ফুট প্রতি সেকেণ্ডে।

আমার বাড়িতে দোতালায় ওঠার তুটো সিঁড়ি আছে। একটা সিঁড়িতে অনেকগুলো ছোট ছোট ধাপ, অপরটিতে বড় কয়েকটা ধাপ। তুটো সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই আমার সমান সময় লাগে, ধর এক মিনিট। প্রথম সিঁড়িতে এক মিনিটে
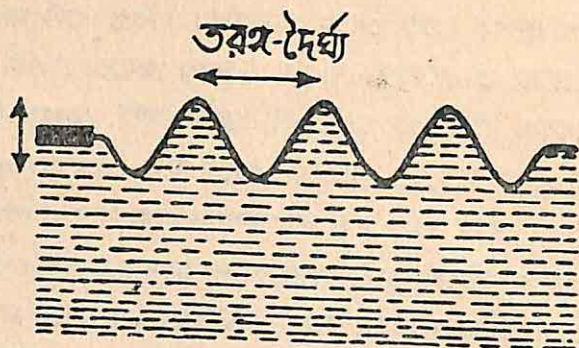
—1—

জলের ঢেউ।

একটা পাত উপর নিচে কাঁপিয়ে জলে ঢেউ তৈরী করা হচ্ছে। ঢেউয়ের মাথা বা সবচেয়ে উঁচু জায়গাটিকে আমরা বলবো ঢেউয়ের 'চূড়ো'। ছুটি পাশাপাশি চূড়োর মধ্যের দূরত্বকে বলবো 'তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য'। এখানে পাতটা পুরোপুরি তিনবার কেঁপে তিনটে ঢেউ অর্থাৎ তিনটে চূড়ো তৈরী করেছে। একবার উপরে ওঠা ও একবার নিচে নামাকে মিলিয়ে পাতটা একবার কেঁপেছে ধরা হয়।

আমাকে অনেকগুলো ধাপ ভাঙ্গতে হয়। দ্বিতীয় সিঁড়িতে সেই সময়েই তার থেকে অনেক কম ধাপ ভাঙ্গতে হয়। আমার চলাকে যদি জলের ঢেউয়ের চলার সঙ্গে তুলনা কর তবে তুমি বলতে পার, প্রথমবারে আমার কম্পন-সংখ্যা বেশী কিন্তু তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কম, দ্বিতীয়বারে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বেশী কিন্তু কম্পন-সংখ্যা কম। কিন্তু আমার গতি ছ'বারেই সমান। অর্থাৎ একটা ধাপ ভাঙ্গা হচ্ছে একটা কম্পন, আর ছুটো পাশাপাশি

সিঁড়ির দূরত্ব হচ্ছে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য। তাহ'লে এক মিনিটে আমি যতখানি যেতে পারি তা হচ্ছে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আর কম্পন-সংখ্যার গুণফল। অর্থাৎ

ঢেউয়ের গতিবেগ = তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য × কম্পন-সংখ্যা

এই কথাটা আমার সিঁড়ি-ভাঙ্গার ব্যাপারে যেমন খাটে সব ঢেউয়ের ব্যাপারেও তেমনি খাটে। ঢেউয়ের গতিবেগ নির্ভর করে যার ভিতর দিয়ে ঢেউ যাচ্ছে, সেই মাধ্যমের উপরে। তাই একই মাধ্যমে সব কম্পন-সংখ্যারই ঢেউয়ের গতি সমান। কম্পন-সংখ্যা বেশী হলে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কম হয়, কম্পন-সংখ্যা কম হলে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বেশী হয়।

জলে যেমন ঢেউ হয়, তেমনি কথা বললে বা কোন শব্দ করলে বাতাসে ঢেউ হয়। এই ঢেউকেই আমরা শব্দের ঢেউ বলি। জলের ঢেউয়ের মত আমরা কিন্তু শব্দের ঢেউ চোখে দেখতে পাই না। স্বভাবের দিক থেকে জলের ঢেউ আর শব্দের ঢেউয়ের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে, কিন্তু রূপের দিকে একেবারেই অমিল। শব্দের ঢেউ জলের ঢেউয়ের মত উঁচু-নিচু হয় না, সেখানে বাতাসের কণাগুলো কোথাও পরস্পর কাছাকাছি চলে আসে, কোথাও বা দূরে সরে যায়। যেখানে কণাগুলো কাছাকাছি চলে আসে, সেখানে বাতাস ঘন হয়। বাতাসের চাপ বাড়ে। যেখানে কণাগুলো পরস্পর দূরে চলে যায় সেখানে বাতাস পাতলা হয়, বাতাসের চাপ কমে। নিচের

ছবিতে একটা পাত ক্রমাগত কাঁপলে তার থেকে কি করে বাতাসে ক্রমাগত ঢেউয়ের সৃষ্টি হয় তা আঁকা হয়েছে। আমরা যখন কথা বলি তখন গলার পর্দায় কাঁপুনিতে বাতাস কেঁপে

—2—
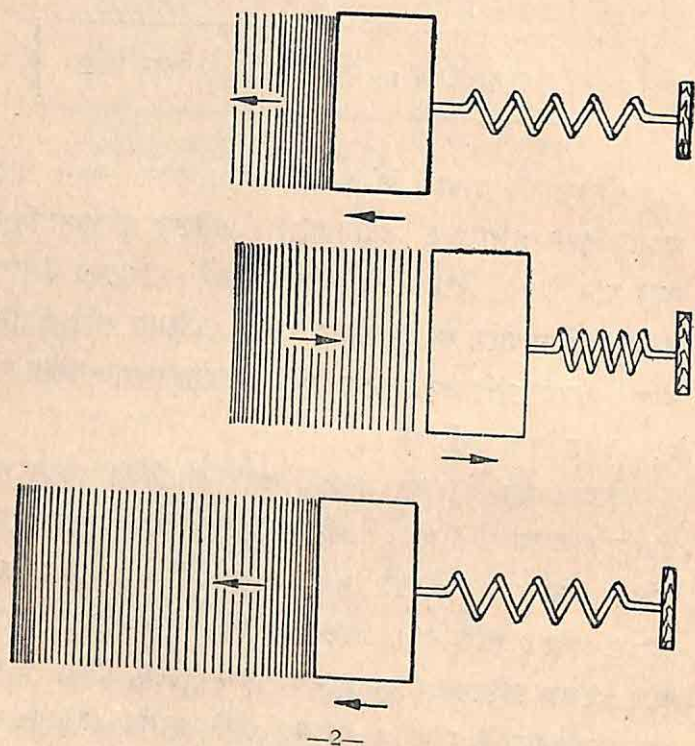
একটা পাত এভাবে ক্রমাগত কাঁপলে
বাতাসে শব্দের ঢেউ সৃষ্টি হয়

এমনি করেই কথার ঢেউ হয়। সে ঢেউ কানের পর্দার গিয়ে পড়লে কানের পর্দা অবিকল সেভাবে কাঁপে। আমরা তখন কথা শুনতে পাই।

স্বভাবের দিক থেকে জলের ঢেউয়ের সঙ্গে শব্দের ঢেউয়ের কি কি মিল রয়েছে? শব্দের ঢেউয়েরও জলের ঢেউয়ের মত তীব্রতা, গতি কম্পন-সংখ্যা ও তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য রয়েছে। জলের ঢেউয়ের তীব্রতা হচ্ছে তার চূড়োর উচ্চতা। তেমনি শব্দের ঢেউয়ের তীব্রতা হচ্ছে বাতাসের চাপের কমা-বাড়ার মাত্রাটা। সব চেয়ে চাপ যেখানে বেশী তাকে জলের ঢেউয়ের চূড়োর সঙ্গে তুলনা করতে পারো। তাহ'লে শব্দের ঢেউয়ের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হ'ল পাশাপাশি সবচেয়ে বেশী চাপযুক্ত বা সবচেয়ে ঘন দুটো জায়গার মধ্যেকার দূরত্বটুকু। কথা বলার সময় গলার পর্দা সেকেণ্ডে যতবার কেঁপেছে তাই হ'ল শব্দের ঢেউয়ের কম্পন-সংখ্যা। এক সেকেণ্ডে শব্দের ঢেউ 320 মিটার (1 মিটার 1 গজের থেকে অল্প বেশী) এগিয়ে যায় অর্থাৎ শব্দের ঢেউয়ের গতি সেকেণ্ডে 320 মিটার—1100 ফুট। দূরে গেলে জলের ঢেউ মিলিয়ে যায়। শব্দের ঢেউও তেমনি কিছুদূর গিয়ে মিলিয়ে যায়। তুমি যখন চিৎকার করে কথা বল তখন শব্দের তীব্রতা খুব বেশী হয়, কথাটা জোরে শোনা যায়। ফিসফিস করে কথা বললে শব্দের তীব্রতা কম হয়, কথাটা আস্তে শোনা যায়। দূরে ঢেউ মিলিয়ে যায় ব'লে চিৎকার করে কথা বললেও অনেক দূর থেকে তা শোনা যায় না। তাই শব্দের ঢেউকে দূত করে আমরা অনেক দূরে কথা পাঠাতে পারি না।

৩
কথার ছবি

আমার ছবি দেখিয়ে তোমাকে বোধ হয় খুব খুশী করতে পারব না। কিন্তু আমার কথার ছবি দেখলে তুমি হয়তো খুশী হবে।

তুমি ভাবছো কথার আবার ছবি কি? কথা কি চোখে দেখা যায়? বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দেখ, আমার কথার ছবি।
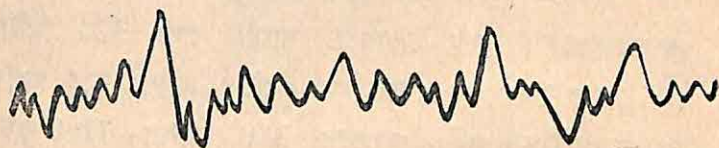
—3—

নাঃ, আমার কথার ছবি দেখেও তুমি খুশী হ'লে না। ভাবছো, এসব আবার কি হিজিবিজি? এ ছবি নাকি?

বেশ, তাহ'লে কথাটা আরো খুলেই বলি। গ্রামোফোন রেকর্ড বাজিয়ে গান শুনলে তুমি নিশ্চয় খুশী হও। গ্রামোফোনের পুরো রেকর্ডটাই হচ্ছে গানের ছবি। একটা ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস নিয়ে গ্রামোফোন রেকর্ড দেখলে কতগুলো আঁকাবাকা হিজিবিজি রেখার ছাপ দেখতে পাবে। এদের চেহারা আমার কথার ছবির মতনই। তেমনি সিনেমাতে গিয়ে তুমি যে কথা শুনতে পাও, তার ছবিও ফিল্মের পাশে এরকম হিজিবিজি করে আঁকা থাকে।

আচ্ছা, তোমাকে আর একটা ছবি দেখাই। ধর, তোমার জ্বর হয়েছে। ডাক্তার এসে বলে গেল টেম্পারেচার-চার্ট রাখতে। সকাল নটায় তোমার টেম্পারেচার 99°, তুপুর বারটায় 103°, বিকেল তিনটেয় 100°, আর সন্ধ্যা ৬টায়
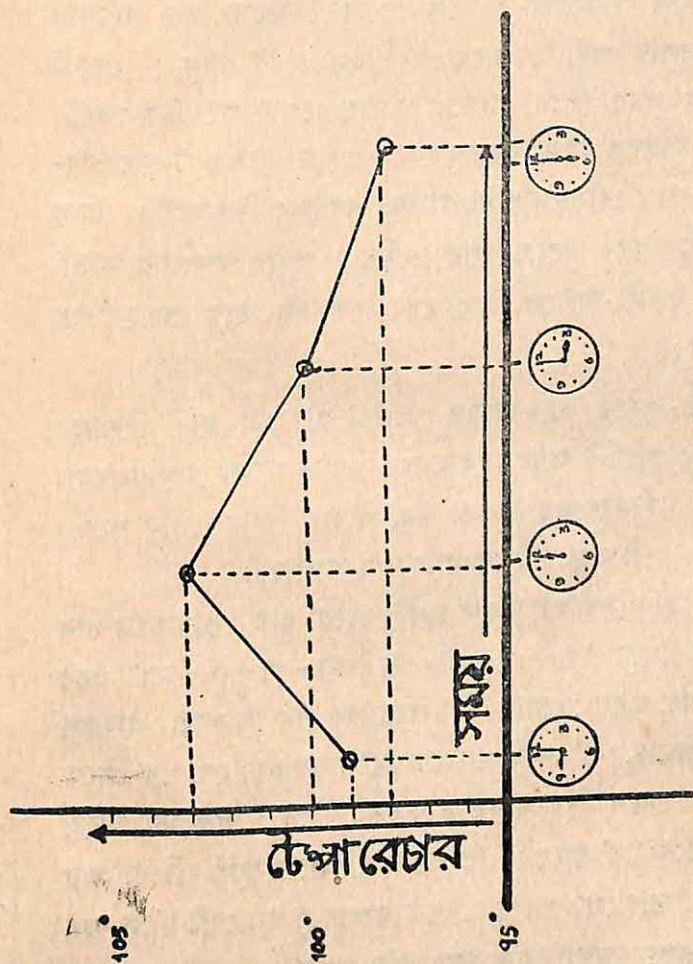
—4—

টেম্পারেচার-চার্ট বা গ্রাফ। টেম্পারেচার ও সময়ের মাপের হিসেব থেকে আঁকা বিন্দুগুলিকে একটি রেখা দিয়ে যুড়ে দেওয়া হয়েছে। এই আঁকা-বাঁকা রেখাটিকেই বলা হয় 'গ্রাফ'।

98°। তাহ'লে টেম্পারেচার-চার্ট হবে 4নং ছবির মত। এই ধরনের ছবিকে বলে 'গ্রাফ্'। শুধু যে টেম্পারেচারের গ্রাফ্ হয় তা নয়। সময়ের সঙ্গে যা-কিছু বদলায় সব-কিছুরই এমনি গ্রাফ্ আঁকা যায়। রেকর্ডে যে হিজিবিজি ছবিগুলো দেখতে পাবে সেগুলো গান গাইবার সময় গলার পর্দা যেভাবে কেঁপেছিল তারই গ্রাফ্। রেকর্ড চলবার সময় পিনে লাগলে 'সাউণ্ড-বক্সের' পর্দা ঠিক তেমনি ভাবে কাঁপতে থাকে বলে তুমি গান শুনতে পাও। টেম্পারেচার-গ্রাফে সময় বোঝানোর যা কায়দা, এখানেও ঠিক তাই। কিন্তু টেম্পারেচারের বদলে আঁকা রয়েছে পর্দার কম্পনের 'মাত্রা' অর্থাৎ পর্দাটি কাঁপতে গিয়ে যখন যতখানি সরে গেছে তার মাপটা।

13 পৃষ্ঠায় অনেকরকম শব্দের কয়েকটা ছবি দিলাম। প্রত্যেক ছবিটিই আলাদা ধরনের। কোন শব্দের কম্পন-সংখ্যা বেশী। কোন শব্দের তীব্রতা কম, আবার কোন কোন শব্দের ছবির চেহারা অন্য ছবি থেকে একদম আলাদা।

ঐ ছবি দেখলেই কথার রূপটা বোঝা যায়। তুমি যখন গান শিখতে গিয়ে 'সা—রে—গা—মা—পা—ধা—নি—সা' করে গলা সাধ, তখন তোমার গলা দিয়ে পর পর আলাদা আলাদা সুর বেরুচ্ছে, 'সা' থেকে 'রে' তে গেলে সুর চড়া হয়, 'রে' থেকে 'গা'তে গেলে সুর আরও চড়া হয়। 'রে' থেকে 'সা' খাদে, 'গা' থেকে 'রে' খাদে। 13 পৃষ্ঠার ছবিগুলো তুমি যদি বাজিয়ে দেখতে তাহ'লে শুনতে পেতে কম্পন-সংখ্যা বেশী হ'লে সুর চড়া, কম্পন-সংখ্যা কম হলে সুর খাদে। তাহ'লে বুঝতে
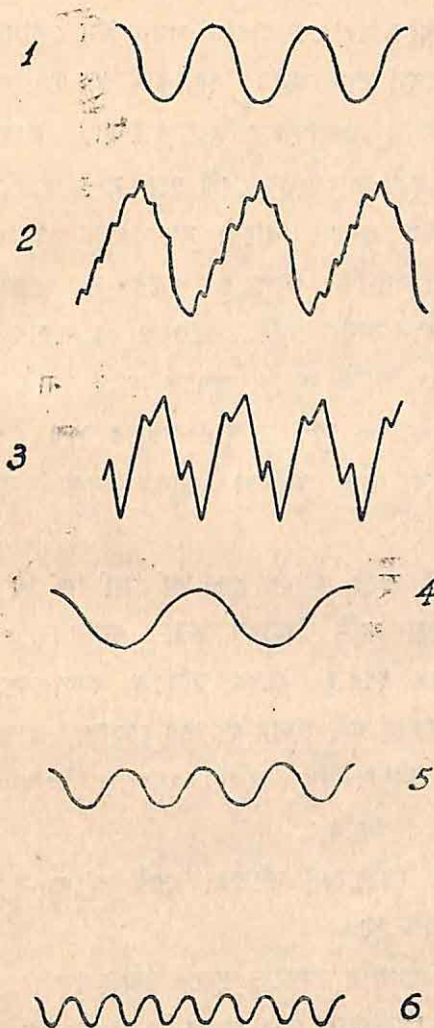
—5—

নানারকমের শব্দের কম্পনের গ্রাফ। 1, 4, 5 এবং 6-এর একই ধ্বনি, কিন্তু স্বর ও তীব্রতা এক নয়। 2 এবং 3-এর ধ্বনি এদের থেকে ভিন্ন।

পারছো 'সা' থেকে 'রে' তে যাবার সময় তুমি তোমার গলার পর্দার কম্পন-সংখ্যা বাড়াচ্ছো। ধর, তুমি সুর চড়া করে যাচ্ছ অর্থাৎ কম্পন-সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়ে যাচ্ছো। কম্পন-সংখ্যা যদি সেকেণ্ডে কুড়ি হাজারের বেশী হয়ে যায় তাহ'লে আমি সে শব্দ মোটেই শুনতে পাবো না কারণ আমার কানের পর্দা অত তাড়াতাড়ি কাঁপতে পারে না, তেমনি সুর খাদে এনে কম্পন-সংখ্যা যদি সেকেণ্ডে পনেরোর কম হয় তবে সে শব্দও আমি কানে শুনতে পাই না। মানুষের গলায় অবশ্য কম ও বেশী কম্পন-সংখ্যার শব্দ তৈরী করা যায় না। তবে যন্ত্রে আমরা এরকম শব্দ তৈরী করতে পারি।

কিন্তু একই সুরে আমরা তো 'অ' 'আ' 'ক' 'খ' ইত্যাদি আলাদা আলাদা ধ্বনি উচ্চারণ করতে পারি। এদের ছবি তা'হলে কিরকম হবে? এদের ছবিতে কম্পন-সংখ্যা যদি সমান হয়, তীব্রতাও যদি সমান হয় তবু চেহারা আলাদা হবে অর্থাৎ ছবির আঁকা-বাঁকা ধরনটা আলাদা আলাদা হবে। তাহ'লে আমরা দেখলাম:

- শব্দের ঢেউয়ের তীব্রতা বেশী হ'লে কানে-শোনা শব্দের জোর বেশী হয়।
- কম্পন-সংখ্যার তফাতে সুরের তফাৎ হয়।
- ঢেউয়ের চেহারার তফাতে ধ্বনির তফাৎ হয়।

৪

আলোর সুর

কান দিয়ে যেমন অনেক সুর শুনতে পাও, তেমনি চোখ দিয়ে তুমি অনেক সুর দেখতে পাও। অবাক হচ্ছো?

আচ্ছা, চারপাশে তাকিয়ে তুমি কি দেখছো বলতো? আমি দেখছি, ফুলদানিতে লাল রঙের ফুল, কমলা রঙের টেবিলক্লথ, জানালা দিয়ে দেখছি নীল আকাশ, সাদা মেঘ, সবুজ রঙের একটা ঘুড়ি। লাল, কমলা, নীল, সবুজ এরা প্রত্যেকেই এক একটা সুর। সাদা হচ্ছে সাতটা রঙের মিশেল।

তবুও তুমি ভাবছো, এগুলো তো রঙ। এরা আবার সুর হ'ল কি করে!

এগুলো সুর, কারণ আলো হচ্ছে ঢেউ, যেমন জলের ঢেউ, শব্দের ঢেউ। কথার সুর বুঝি তার কম্পন-সংখ্যা বা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য দিয়ে। তেমনি রঙ বুঝি আলোর ঢেউয়ের কম্পন-সংখ্যা বা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য দিয়ে।

লাল, কমলা, হলদে, সবুজ, নীল, ঘননীল, বেগুনী—এরা হচ্ছে আলোর সুরের সা—রে—গা—মা—পা—ধা—নি। লালের কম্পন-সংখ্যা সব থেকে কম। তার থেকে বেশী কমলা রঙের, সব থেকে বেশী বেগুনীর। সাদা হচ্ছে এই সাতটা রঙের মিশেল। এদের থেকেই তুটো তিনটে মিশিয়ে মিশিয়ে

আমরা সব রঙ পেতে পারি। আলো না থাকলেই অন্ধকার অর্থাৎ কালো। কালো হচ্ছে সব রঙের অভাব!

কানে যেমন খুব কম বা খুব বেশী কম্পন-সংখ্যার স্বর শুনতে পাই না, তেমনি চোখেও আমরা লালের থেকেও কম কম্পন-সংখ্যার আলো (Infra-red) বা বেগুনীর থেকে বেশী কম্পন-সংখ্যার আলো (Ultra-violet) দেখতে পাই না।

তুমি হয়তো জানতে চাও এদের কম্পন-সংখ্যা কত আর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যই বা কত? কম্পন-সংখ্যা এত বেশী আর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এত কম যে তুমি জানলে অবাক হয়ে যাবে। বেগুনী রঙের কম্পন-সংখ্যা সেকেণ্ডে সাতশো পঞ্চাশ লক্ষ কোটি আর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির তু' লক্ষ ভাগের তিন ভাগ। লাল রঙের কম্পন-সংখ্যা সেকেণ্ডে চারশো লক্ষ কোটি আর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির এক লক্ষ ভাগের তিন ভাগ। তাহ'লে আলোর ঢেউয়ের গতি কি হবে? তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যকে কম্পন-সংখ্যা দিয়ে গুণ করলেই গতিবেগ পাওয়া যায় এ কথা নিশ্চয় তোমার মনে আছে। কাগজ-পেন্সিল নিয়ে হিসেব করলে দেখতে পাবে আলোর গতিবেগ সেকেণ্ডে প্রায় পৌনে তু'লক্ষ মাইল। সঠিক হিসেব হচ্ছে সেকেণ্ডে 1,86,000 মাইল – 300,000,000 মিটার।

আলো যে ঢেউ সে কথা তো বললাম। কিন্তু কিসের ঢেউ আর কার মধ্যে ঢেউ সে কথা এখনো তোমাকে বলি নি। আলোর ঢেউ হচ্ছে বিত্যুতের ঢেউ। বিত্যুতের কথা ভাল করে বলার পর আলোর ঢেউয়ের কথা আবার বলবো।

তবে একটা কথা মনে রেখো, জলের ঢেউ বা শব্দের ঢেউয়ের থেকে, প্রকৃতির দিক দিয়ে দেখতে গেলে, আলোর ঢেউয়ের একটা বড় রকমের তফাৎ রয়েছে। জলের ঢেউ ওঠে জলে, শব্দের ঢেউ ওঠে বাতাসে। সেখানে জল নড়ছে, বাতাস কাঁপছে। কিন্তু আলোর ঢেউয়ের বেলায় এরকম কোন-কিছুর দরকার হয় না। শুধু শূন্যের মধ্যেও আলোর ঢেউ হ'তে পারে। আলোর ঢেউ যখন জলের বা বাতাসের মধ্যে দিয়ে যায়, তখন জল নড়ে না, বাতাস কাঁপে না। কিন্তু ঢেউ ঠিক বয়ে যায়। যেমন সূর্য থেকে আলো যখন আমাদের কাছে আসে, তখন মাঝখানে শুধু শূন্য। জল বাতাস কিছু নেই। তবু আলোর ঢেউ ঠিকই আসে।

লাল আলোর থেকে বেশী তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো অর্থাৎ কম কম্পন-সংখ্যার আলো আমরা দেখতে পাই না কিন্তু অনুভব করতে পারি। তা হচ্ছে তাপের ঢেউ। তাহ'লে তাপের ঢেউ হচ্ছে অদৃশ্য আলো, অর্থাৎ বেশী তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিদ্যুতের ঢেউ। এরা 1 মিলিমিটার (1 মিটারের হাজার ভাগের এক ভাগ) পর্যন্ত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের হয়।

বিদ্যুতের ঢেউয়ের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আরও বাড়িয়ে কয়েক মিটার করে নিলে সে ঢেউ আমরা চোখে দেখি না। তাপ হিসেবেও অনুভব করতে পারি না। তবে যন্ত্র দিয়ে সে ঢেউকে ধরতে পারা যায়। এই ঢেউই হ'ল বেতারের ঢেউ বা রেডিওর ঢেউ। বেতারের ঢেউ যে যন্ত্র দিয়ে সৃষ্টি করা হয় তাকে বলে 'ট্রান্‌স্‌মিটার।' আর যে যন্ত্রে ধরা

হয় তার নাম 'রেডিও রিসিভার' বা সোজা কথায় রেডিও।

আবার আলোর কথায় আসি। লাল রঙের কাঁচের ভিতর দিয়ে তুমি যদি সাদা আলোর দিকে তাকাও তবে লাল আলোই দেখবে, কারণ সাদা রঙের সাতটা রঙের মধ্যে শুধু লাল রঙটাই লাল কাঁচের ভিতর দিয়ে যেতে পারে, অন্য কোন রঙই তোমার চোখে যাবে না। অন্য রঙের দিকে তাকালে সেগুলো কালো দেখাবে।

রেডিওর বেলাতে আলাদা আলাদা জায়গার ট্রান্স্মিটার থেকে আলাদা আলাদা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিদ্যুতের ঢেউ পাঠান হয়। লাল কাঁচের ভিতর দিয়ে আলো যাবার সময় লাল বাদে সব রঙের ঢেউ আটকা পড়ে গিয়েছিল, ঠিক তেমনই রেডিও রিসিভারে আমরা এমন ব্যবস্থা করতে পারি যে আমার পছন্দমত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের ঢেউ ছাড়া আর কোন ঢেউই ধরা পড়বে না। রেডিওর কাঁটা ঘুরিয়ে আমার খুশিমত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের ঢেউ বেছে নিতে পারি। একে বলে সুর বাঁধা বা 'টিউনিং'। কলকাতার রেডিও স্টেশন থেকে যে বিদ্যুতের ঢেউ পাঠানো হয় তাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হচ্ছে 370·4 মিটার, 300 মিটার, 61·48 মিটার ইত্যাদি। তোমার নিশ্চয় মনে আছে বিদ্যুতের ঢেউয়ের গতি হচ্ছে সেকেণ্ডে 300,000,000 মিটার। তাহ'লে এই ঢেউগুলোর কম্পন-সংখ্যা হ'ল সেকেণ্ডে

(∵ কম্পন সংখ্যা × তরঙ্গ দৈর্ঘ্য = গতিবেগ)

$300,000,000 \div 370{\cdot}4 = 810,000$
$300,000,000 \div 61{\cdot}48 = 4880,0\ 0$
$300,000,000 \div 300 = 1,000,000$

একটা কম্পনকে বলা হয় 1 সাইক্‌ল্। 1000 হাজার সাইক্‌ল্‌কে বলা হয় 1 কিলোসাইক্‌ল্ ; 1000 কিলোসাইক্‌ল্‌কে বলা হয় 1 মেগাসাইক্‌ল্। তাহ'লে কলকাতার রেডিওর কম্পন-সংখ্যা হ'ল সেকেণ্ডে, 810 কিলোসাইক্‌ল্, 4·88 মেগাসাইক্‌ল্, 1 মেগাসাইক্‌ল্।

৫

বিদ্যুতের গোড়ার কথা

স্থইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে পাখা ঘুরিয়ে বিদ্যুতের কাণ্ড-কারখানা দেখিয়ে গাঁয়ের লোককে তুমি অবাক করে দিতে পার। সে যদি প্রশ্ন করে কি করে হয়—তুমি হয়তো বিজ্ঞের মত ভারিক্কিচালে বলবে ওসব 'ইলেক্‌ট্রিসিটি'তে হয়।

—6—
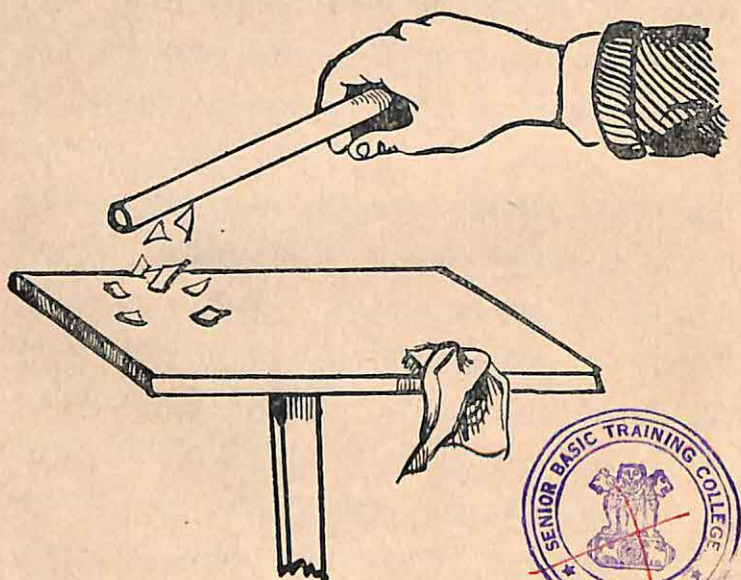
ইলেক্‌ট্রিসিটিতে হয় বললেই তো সব কথা ফুরিয়ে যায় না। ইলেক্‌ট্রিসিটি বা বিদ্যুতের 'আসল' কথাটা জানলে তুমি

তাকে আরও তাক লাগিয়ে দিতে পার। সে কথাটাই এবারে তোমাকে শিখিয়ে দিই।

বিদ্যুতের সব ব্যাপারটাই মজার! প্রথমেই তোমাকে একটা মজার খেলা দেখাই। একটা কাঁচের ডাণ্ডার গায়ে যদি সিল্কের টুকরো ঘষে যে ভাবে আগের পাতায় ছবিতে আছে সে ভাবে হালকা কাগজের কুচির উপরে ধর তাহ'লে দেখবে কাগজ-কুচিগুলি আপনা থেকে লাফিয়ে ডাণ্ডার গায়ে লাগবে। কেন এমন হলো? কাঁচের গায়ে তো এমনিতে কাগজ-কুচি ওঠে না। কাঁচের গায়ে কি ভূত ভর করেছে?

তোমাকে চুপিচুপি বলি, এই ভূতটাই হচ্ছে বিদ্যুৎ। সিল্কের টুকরোটার গায়েও বিদ্যুৎ ভর করেছে কিন্তু কাঁচের বিদ্যুৎ আর সিল্কের বিদ্যুৎ আলাদা জাতের। কাঁচের বিদ্যুৎকে বলে 'পজিটিভ' বিদ্যুৎ আর সিল্কের বিদ্যুৎকে বলে 'নেগেটিভ' বিদ্যুৎ। পজিটিভ, নেগেটিভ সমান সমান মিশে থাকলে বিদ্যুৎ আছে কি নেই বোঝা যায় না!

বিদ্যুৎ এলো কোথা থেকে? এর উত্তর হল সব জিনিসেই বিদ্যুৎ রয়েছে, পজিটিভ আর নেগেটিভ সমান সমান মিলে-মিশে।

একটা বড় বাড়ি যেমন অনেক ইট গেঁথে গেঁথে তৈরী হয়, তেমনই সব জিনিসই খুব ছোট ছোট কণা দিয়ে তৈরী বলে ভাবা যায়। এদের ঠিক নাম হচ্ছে 'পরমাণু'। এগুলো এত ছোট যে চোখে দেখা যায় না, পরমাণু যদি চোখে দেখা যেত তবে তার মোটামুটি চেহারা হ'ত পরের পাতার ছবির মত। মাঝখানের অংশটুকুকে বলে পরমাণুর কেন্দ্র। কেন্দ্রের চারদিকে যে কণাগুলি ঘোরাফেরা করছে তাদের বলে

'ইলেক্‌ট্রন'। ইলেক্‌ট্রনের ওজন কেন্দ্র থেকে অনেক কম, হালকা। কেন্দ্র ও ইলেক্‌ট্রন দুয়েতেই বিদ্যুৎ থাকে। কেন্দ্রের বিদ্যুৎ পজিটিভ। ইলেক্‌ট্রনের বিদ্যুৎ নেগেটিভ।
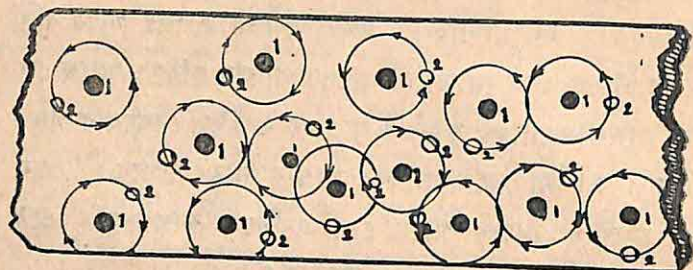
—7—

পরমাণুর কেন্দ্র ও ইলেকট্রন

1—পরমাণুর কেন্দ্র; 2—ইলেকট্রন।

বিদ্যুতের কথা ভাল করে জানতে হ'লে আগে তোমাকে ইলেক্‌ট্রনদের মেজাজের খবর জানতে হবে। পরমাণুর কেন্দ্র ওজনে ভারী। তাই চলাফেরা নড়াচড়া করতে চায় না। কিন্তু ইলেক্‌ট্রনরা হালকা বলে নড়াচড়া চলাফেরা করতে পারে।

যেখানে ইলেক্‌ট্রনদের ভীড় সেখানে অন্য ইলেক্‌ট্রনরা যেতে চায় না। তার কারণ নেগেটিভ বিদ্যুৎ নেগেটিভ বিদ্যুতের থেকে দূরে থাকতে চায়। পজিটিভ বিদ্যুতের বেলায়ও সে কথা খাটে। দুটো পজিটিভ বিদ্যুতের কণা পরস্পর দূরে থাকতে চায়। পজিটিভ নেগেটিভের বেলায় কিন্তু ঠিক তার উল্টো। পজিটিভ আর নেগেটিভ বিদ্যুতের কণারা কাছে থাকতে চায়। তাই ইলেক্‌ট্রনরা কেন্দ্রের কাছাকাছি থাকে। পারতপক্ষে নিজের কেন্দ্রকে ছেড়ে ইলেক্‌ট্রন অন্য কেন্দ্রের কাছে যায় না। কেন্দ্রের পজিটিভ বিদ্যুতের পরিমাণ তার চারদিকে

যে নেগেটিভ ইলেক্ট্রনরা ঘোরাফেরা করছে তাদের বিদ্যুতের পরিমাণের সমান। সমান সমান পজিটিভ আর নেগেটিভ বিদ্যুৎ এভাবে কাছাকাছি থাকার দরুন সাধারণতঃ বিদ্যুৎ আছে কি-না বোঝা যায় না।

কাঁচকে সিল্কের রুমাল দিয়ে ঘষলে কাঁচের কিছু ইলেক্ট্রন সিল্কের গায়ে চলে যায়। ফলে কাঁচে পজিটিভ বিদ্যুতের পরিমাণ বেশী হয়ে যায়। সিল্কে নেগেটিভ বিদ্যুতের পরিমাণ পজিটিভ বিদ্যুৎ থেকে বেশী হ'য়ে যায়। তাই কাঁচে সিল্ক ঘষলে কাঁচের মোট বিদ্যুৎ পজিটিভ আর সিল্কের মোট বিদ্যুৎ নেগেটিভ হয়।

ইলেক্ট্রিক সেল বা ব্যাটারী দিয়ে ইলেক্ট্রনদের চলাফেরা করতে 'লোভ' দেখান যায়। এ নিয়ে একটা পরীক্ষা কর। টর্চের ব্যাটারীর সাথে একটা টর্চের বাল্‌ব্ তামার তার দিয়ে (8 নং) ছবিতে যেভাবে আঁকা আছে সেভাবে জুড়ে দাও। বাল্‌ব্‌টা জ্বলছে। এবার তারটাকে মাঝখানে কেটে দাও (9 নং ছবি)। আলো নিভে গেল।

বাল্‌ব্-এর তারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ গেলে আলো জ্বলে। প্রথম বারে তারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ যাচ্ছিল। ব্যাটারীর একটা মাথাকে আমরা বলি নেগেটিভ (−) অন্য মাথাকে বলি পজিটিভ (+)। ব্যাটারী বাইরের তারের ইলেক্ট্রন-গুলিকে নেগেটিভ থেকে পজিটিভের দিকে যেতে লোভ দেখায়। তার জুড়ে দিলে ইলেক্ট্রনরা তাই ক্রমাগত চলতে থাকে। ব্যাটারীর পজিটিভ প্রান্তে গিয়ে তারা থেমে থাকে না, ব্যাটারীর ভেতর দিয়ে পজিটিভ থেকে নেগেটিভে বেরিয়ে এসে আবার আগের মত চলতে থাকে।

ইলেক্‌ট্রনদের তারের ভেতর দিয়ে এভাবে ক্রমাগত চলাকে বলে বিদ্যুতের প্রবাহ বা 'কারেন্ট'। তার কেটে দিলে

—৪— —৫—
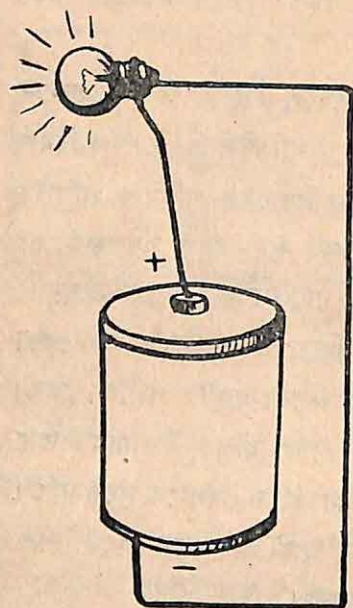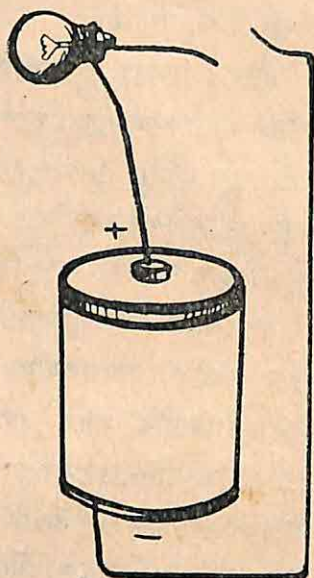
ইলেক্‌ট্রনরা চলার পথ পায় না। তখন কারেন্ট থেমে যায়, আলোও জ্বলে না।

একটা খেলার মধ্যে দিয়ে কারেন্টের ব্যাপারটা অন্যভাবে বুঝতে পার। তোমার খেলার সাথীদের নিয়ে গোল হয়ে সবাই পর-পর দাঁড়াও। সবাই হাতে একটা করে কমলালেবু নাও। তোমরা হ'লে পরমাণুর কেন্দ্র আর কমলালেবুগুলো হ'ল তোমাদের ইলেক্‌ট্রন। এবার তোমার ডানদিকের জনকে তোমার কমলালেবুটা দাও, আর তার হাতের লেবু তার ডান-

দিকের জনের হাতে দিতে বল। এরকম ভাবে সবাই যদি তার ডানদিকের জনকে লেবু দিতে থাকে আর বাঁদিকের জনের লেবু নিজের হাতে নিতে থাকে তবে বলতে পার তোমাদের হাতে হাতে কমলালেবুর কারেন্ট চলে যাচ্ছে। ব্যাটারীর তার জুড়ে দিলে এমনি করে ইলেক্‌ট্রনরা এক পরমাণু থেকে ক্রমাগত আর এক পরমাণুতে যেতে থাকে।

তামার তারের বদলে রবার বা সিল্কের সুতো দিলে দেখবে আলো জ্বলছে না; অর্থাৎ ব্যাটারী লোভ দেখান সত্ত্বেও ইলেক্‌ট্রনরা যাচ্ছে না। তার কারণ এদের ইলেক্‌ট্রনদের বাইরের টান থেকে ঘরের টান বেশী তাই লোভ দেখালেও তারা চলে না। তামা রূপো ইত্যাদি যে কোন ধাতু, কার্বন (কয়লা), এদের ভেতরের ইলেক্‌ট্রনরা লোভ দেখালেই চলতে থাকে। তাই ধাতুর তারের ভেতর দিয়ে কারেন্ট চলে, কিন্তু রবার, কাঠ, সিল্ক, প্লাস্‌টিক, এদের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ চলে না। যাদের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ চলে না তাদের বলা হয় 'ইনস্যুলেটর'। যাদের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ চলে তাদের বলে 'কনডাক্‌টর'।

বিদ্যুৎ-বিশারদের চল্‌তি ভাষায়—ইলেক্‌ট্রনরা যেদিকে যাচ্ছে তার উল্টোদিকটাকে কারেন্ট চলার দিক বলা হয়। এধরনের উল্টো কথা বলাটাই বরাবর চলে আসছে। অর্থাৎ বিদ্যুতের চল্‌তি ভাষায় তোমাকে বলতে হবে, তারের ভেতর দিয়ে ব্যাটারীর পজিটিভ থেকে নেগেটিভের দিকে কারেন্ট চলে। বিদ্যুৎ চলার পুরো পথটাকে বলা হয় 'সারকিট্'।

আমি যাকে বলেছি 'ইলেক্‌ট্রনের পথ চলার লোভ'

বিদ্যুতের চল্‌তি ভাষায় তাকে বলে 'ভোল্টেজ'। তারের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ তখনি চলতে পারে যখন দু'মাথার মধ্যে ভোল্টেজের তফাৎ থাকে। যেদিকে ভোল্টেজ বেশী, ইলেক্‌-ট্রনরা সেদিকে যায় কিন্তু চল্‌তি কথায় আমরা বলি কারেন্ট বেশী থেকে কম ভোল্টেজের দিকে যায়। অর্থাৎ পজিটিভের ভোল্টেজ নেগেটিভের থেকে বেশী। একথাটা যেমন পুরো তারের বেলায় খাটে তেমনি তারের যে কোন দুই বিন্দুর মধ্যের অংশের বেলায়ও খাটে। অর্থাৎ তারের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট চললেই বুঝতে হবে তারের যে কোন দুই বিন্দুর মধ্যে ভোল্টেজের তফাৎ রয়েছে। এমনিতে ব্যাটারীর দু'মাথার মধ্যে ভোল্টেজের যে তফাৎ থাকে ব্যাটারীতে তার জুড়ে সারকিট্ পুরো করলেই ভোল্টেজের সেই তফাৎটা পুরো সারকিটে ছড়িয়ে পড়ে।

'ভোল্টমিটার' বলে এক ধরনের যন্ত্র দিয়ে তারের যে কোন দু'জায়গার ভোল্টেজের তফাৎ মাপা যায়। এ মাপটাকে বলা হয় 'ভোল্ট'। ভোল্টমিটারের দুটো মাথা বা টারমিনাল থাকে তার একটাতে (+) অন্যটাতে (−) চিহ্ন দেওয়া থাকে। ভোল্টেজের তফাৎ মাপতে হ'লে তারের যেদিকটা পজিটিভ তার সঙ্গে ভোল্টমিটারের (+) টারমিনাল আর যেদিকটা নেগেটিভ তার সঙ্গে (−) টারমিনাল তার দিয়ে জুড়ে দিতে হয়। ভোল্টমিটারের কাঁটা ঘুরে গিয়ে যেখানে থামবে, সেখানে ডায়ালে যত লেখা রয়েছে, ভোল্টেজের তফাৎ তত ভোল্ট। ব্যাটারী বা সেলের দু'মাথায় ভোল্টমিটার লাগালে ভোল্টেজের যে মাপ পাওয়া যায় তার থেকে ব্যাটারীর জোর

কত তা বোঝা যায়। টর্চের প্রত্যেক নতুন সেলের জোর হচ্ছে 1·4 ভোল্ট।
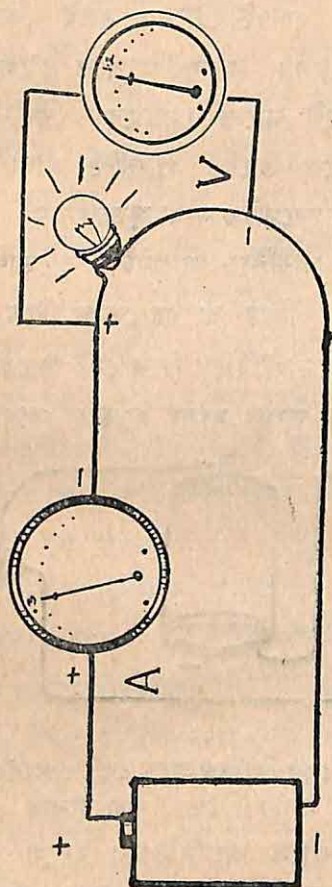
—10—

ভোল্টমিটার ও অ্যামিটার সার্কিটে এভাবে লাগাতে হয়। এই সার্কিটে বাল্‌বের ভেতর দিয়ে ·3 অ্যাম্‌পেয়ারের কারেণ্ট যাচ্ছে এবং বাল্‌বের তু'মাথার মধ্যে ভোল্টেজের তফাৎ 1·2 ভোল্ট।

ভোল্টেজের মত কারেন্টেরও মাপ রয়েছে তার নাম 'অ্যামপেয়ার'। কারেন্ট মাপার যন্ত্রকে বলে 'অ্যামিটার'। অ্যামিটার দেখতে ভোল্টমিটারের মতই কিন্তু সারকিটে জুড়তে হয় অন্যভাবে। কারেন্ট মাপতে হ'লে যে তারের ভেতর দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে সেটাকে কেটে অ্যামিটারের পজিটিভ টারমিনালে তারের পজিটিভ মাথা ও নেগেটিভ টারমিনালে তারের নেগেটিভ মাথা জুড়তে হয়।

10 নং ছবির সারকিটে অ্যামিটার ও ভোল্টমিটার দুই-ই আছে। অ্যামিটার দিয়ে তারের ভেতর দিয়ে যাওয়া কারেন্ট মাপা হচ্ছে আর ভোল্টমিটার দিয়ে সেই তারেরই দু'জায়গার মধ্যের ভোল্টেজের তফাৎ মাপা হচ্ছে। সাধারণত রেডিওর
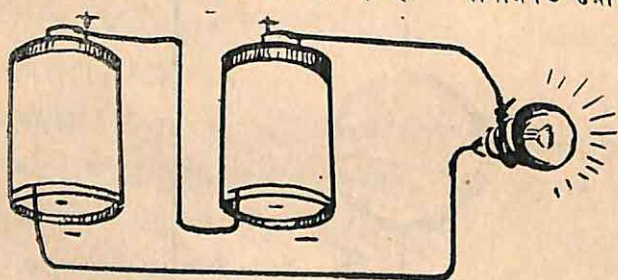
—11—
দুটো সেল সিরিজে জুড়ে বেশী ভোল্টেজের
ব্যাটারী তৈরী করা হয়েছে

সারকিটের মাপজোকে অ্যামিটারের বদলে মিলিঅ্যামিটার ব্যবহার করা হয়। মিলিঅ্যামিটারে মাপা হয় মিলিঅ্যামপেয়ার। মিলিঅ্যামপেয়ার মানে এক অ্যামপেয়ারের হাজার ভাগের একভাগ।

অনেকক্ষণ টর্চ জ্বেলে রাখলে আলোর জোর কমে যায়।

ভোল্টমিটার দিয়ে মাপলে তখন দেখতে পাবে, ব্যাটারীর ভোল্টেজও কমে গেছে। ব্যাটারীর ভোল্টেজ কমে গেলে তারের কারেন্টও কমে যায়। প্রায় সব টর্চেই একটার বদলে দুটো সেল্ ব্যবহার করতে হয়, একটার পজিটিভ আর একটার নেগেটিভের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে (ছবিতে যেমনভাবে দেখান আছে)। একটার বদলে দুটো সেল্ দিয়ে আলো জ্বাললে আলোর জোর বেশী হয়। এভাবে একটার বেশী সেল্ পর-পর জুড়ে দেওয়াকে বলে 'সিরিজ'-এ জুড়ে দেওয়া। দুটো সেল সিরিজে জুড়লে ব্যাটারীর ভোল্টেজ প্রত্যেক সেলের ভোল্টেজের দ্বিগুণ হয়, তিনটে জুড়লে ভোল্টেজ তিনগুণ হয়। এভাবে অনেকগুলো টর্চের সেল্ জুড়ে আমরা বেশী ভোল্টেজের ব্যাটারী তৈরী করতে পারি।

একথাটা তাহ'লে নিশ্চয়ই পরিষ্কার বুঝতে পারছ যে ভোল্টেজ বেশী হ'লে সারকিটে কারেন্ট বেশী হয়, ভোল্টেজ কম হ'লে সারকিটে কারেন্ট কম হয়। ভোল্টমিটার, অ্যামি-টার নিয়ে মাপলে দেখবে, তারের দু'মাথার মধ্যে ভোল্টেজের তফাৎ দ্বিগুণ হ'লে কারেন্ট দ্বিগুণ হয়, ভোল্টেজ তিনগুণ হ'লে কারেন্ট তিনগুণ হয়, ভোল্টেজ অর্ধেক হ'লে কারেন্ট অর্ধেক হয়। এই নিয়মটাকে বলে 'ওম'-এর (Ohm's Law) নিয়ম। ভোল্টেজকে কারেন্ট দিয়ে ভাগ করলে যে সংখ্যাটাকে পাওয়া যায় তাকে বলে 'রেসিস্ট্যান্স্' বা বাধা। 'ওম'-এর নিয়মে যে কোন তারের রেসিস্ট্যান্স্ কারেন্ট বা ভোল্টেজের উপর নির্ভর করে না। কাজেই কোন তারের রেসিস্ট্যান্স একবার জানলেই, যে কোন ভোল্টেজের তফাতে তার ভেতর দিয়ে

যাওয়া কারেণ্ট কত হবে হিসেব করে নেওয়া যায়। 'ওম'-এর নিয়মকে লেখা যায়—

ভোল্টেজ ÷ কারেণ্ট = রেসিস্ট্যান্স
অথবা, ভোল্টেজ = কারেণ্ট × রেসিস্ট্যান্স।

রেসিস্ট্যান্সের মাপকে বলে 'ওম'। দশলক্ষ 'ওম'কে বলে এক 'মেগোম' বা সংক্ষেপে এক 'মেগ'।

এতক্ষণ পর্যন্ত সারকিটের অবিকল ছবি এঁকেছি। কিন্তু অবিকল ছবি আঁকতে গেলে, ছবি বড় হয়, জায়গা বেশী লাগে। ভাল বোঝা যায় না। সেইজন্য অবিকল ছবি না এঁকে
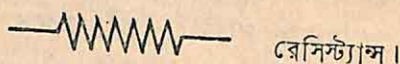
রেসিস্ট্যান্স।

জুড়বার তার।

ব্যাটারী।
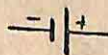
সেল।

—12—

সারকিটের নক্‌শা আঁকা উচিত। নক্‌শা আঁকা হয় নানা রকম চিহ্ন দিয়ে। চিহ্নগুলো উপরের ছবির মত।

এখন থেকে সারকিট বোঝাতে আমি এইসব চিহ্ন দিয়ে

নক্‌শা আঁকবো। দু-একটা সারকিটের নক্‌শা এখানে এঁকে দেখাচ্ছি।

প্রথম নক্‌শা। ব্যাটারীর দু'মাথায় একটা রেসিস্ট্যান্স জুড়ে দেওয়া হয়েছে। 1–2 রেসিস্ট্যান্সের তুলনায় জুড়ে দেবার তার ও ব্যাটারীর রেসিস্ট্যান্স খুবই অল্প। কাজেই পুরো সারকিটের রেসিস্ট্যান্সকে 1–2 রেসিস্ট্যান্সের সমান বলে ধরা যায়। মনে কর ব্যাটারীর ভোল্টেজ 1·5 ভোল্ট, কারেন্ট ·15 অ্যামপেয়ার। তাহ'লে 1–2 রেসিস্ট্যান্স কত?

—13
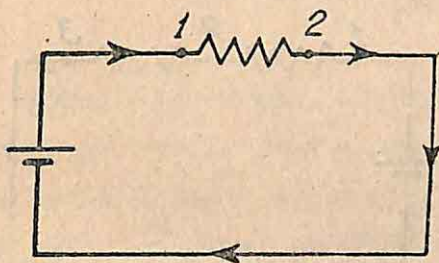
$$\text{'ওম'-এর নিয়মে, রেসিস্ট্যান্স} = \frac{\text{ভোল্টেজ}}{\text{কারেন্ট}}$$

$$= \frac{1{\cdot}5 \text{ ভোল্ট}}{{\cdot}15 \text{ অ্যামপিয়ার}}$$

$$= 10 \text{ ওম}$$

দ্বিতীয় নক্‌শা। দুটো রেসিস্ট্যান্স পর-পর জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এধরনের জুড়ে দেওয়াকে বলে 'সিরিজ'-এ জুড়ে দেওয়া। দুটো রেসিস্ট্যান্স পর-পর জুড়ে দিলে তাদের পুরো

রেসিস্ট্যান্স দুটোর যোগফলের সমান। অর্থাৎ 1–2 যদি 5 ওম হয়, আর 2–3 যদি 10 ওম হয় তাহ'লে 1–3 এর মধ্যে পুরো রেসিস্ট্যান্স হচ্ছে (5+10) ওম = 15 ওম। দুটো রেসিস্ট্যান্স সিরিজে থাকলে তাদের ভেতর-দিয়ে-যাওয়া কারেন্ট একই কিন্তু তাদের প্রত্যেকের দু'মাথার মধ্যে ভোল্টেজের তফাৎ. আলাদা আলাদা হতে পারে। পুরো ভোল্টেজের তফাৎ এদের আলাদা আলাদা ভোল্টেজের তফাতের যোগফল। যদি ব্যাটারী 3 ভোল্টের হয় তবে এই সারকিটে,

—14—
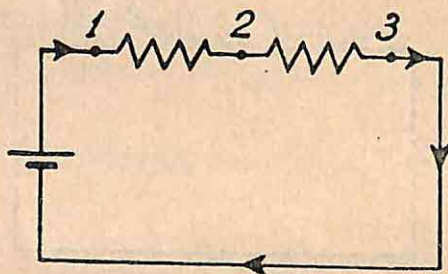
কারেন্ট = 3 ভোল্ট ÷ 15 ওম = $\frac{1}{5}$ অ্যামপেয়ার

= ·2 অ্যামপেয়ার

তাহ'লে 1–2 মধ্যে ভোল্টেজের তফাৎ হ'ল

5 ওম × ·2 অ্যামপেয়ার = 1 ভোল্ট

2–3 মধ্যে ভোল্টেজের তফাৎ হ'ল

10 ওম × ·2 অ্যামপেয়ার = 2 ভোল্ট।

তাহ'লে 1–3'র মধ্যে ভোল্টেজের তফাৎ হ'ল

1 ভোল্ট + 2 ভোল্ট = 3 ভোল্ট।

তৃতীয় নক্শা। দুটো রেসিস্ট্যান্সকে পাশাপাশি জুড়ে দিলে বলা হয় তাদের 'প্যারালাল' (সমান্তরাল) করে
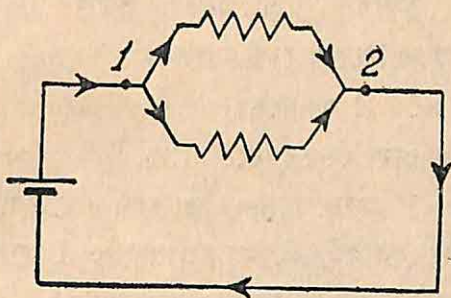
—15—

জুড়ে দেওয়া হয়েছে, প্যারালাল করে 5 ওম আর 10 ওমের দুটো রেসিস্ট্যান্স জুড়ে দিলে 1 – 2'র মধ্যে মোট রেসিস্ট্যান্স হচ্ছে $(5 \times 10) \div (5+10)$ ওম। অর্থাৎ **প্যারালাল করে জুড়ে দেওয়া দুটো রেসিস্ট্যান্স থাকলে তাদের মোট রেসিস্ট্যান্স হচ্ছে তাদের রেসিস্ট্যান্স এর গুণফলকে যোগ-ফল দিয়ে ভাগ করলে যা হবে তাই।** দুটো রেসিস্ট্যান্সের দু'মাথায় ভোল্টেজের তফাৎ সমান কিন্তু তাদের ভেতর দিয়ে যাওয়া কারেণ্ট অসমান। যে রেসিস্ট্যান্সটা কম তার ভেতর দিয়ে বেশী কারেণ্ট যায়, আর যার রেসিস্ট্যান্স বেশী তার ভেতর দিয়ে কম কারেণ্ট যায়। ধর, 1—2'র মধ্যে ভোল্টেজের তফাৎ 10 ভোল্ট। 1 – 2'র পুরো রেসিস্ট্যন্স হচ্ছে, $(5 \times 10) \div (5+10)$ ওম $= \frac{50}{15}$ ওম $= \frac{10}{3}$ ওম

সুতরাং 1 – 2'র মধ্যে মোট কারেণ্ট যাচ্ছে,

$(10 \div \frac{10}{3})$ অ্যামপেয়ার $= 3$ অ্যামপেয়ার।

এই 3 অ্যামপেয়ার কারেণ্টের খানিকটা 5 ওমের ভেতর দিয়ে ও খানিকটা 10 ওমের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। 5 ওমের রেসিস্ট্যান্সের ছু'মাথার ভোল্টেজের তফাৎ 10 ভোল্ট। সুতরাং তার ভেতর দিয়ে কারেণ্ট যাচ্ছে

$10 \div 5 = 2$ অ্যামপেয়ার

তেমনি 10 ওমের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে,

$10 \div 10 = 1$ অ্যামপেয়ার। তা হলে বুঝতে পারছ পুরে 3 অ্যামপেয়ার কারেণ্ট, 2 অ্যামপেয়ার ও 1 অ্যামপেয়ারে ছু'ভাগ হয়ে রেসিস্ট্যান্স ছুটির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে।

লম্বা তারের রেসিস্ট্যান্স বেশী হয়। কারণ, 100 ফুট তারের রেসিস্ট্যান্স যদি 1 ওম হয় তাহ'লে 200 ফুট তারের বেলায় আমরা ভাবতে পারি যে ছুটো 1 ওমের রেসিস্ট্যান্স সিরিজে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই 200 ফুটের রেজিস্ট্যান্স হবে 2 ওম। মোটা তারের রেসিস্ট্যান্স কম হয়। মনে কর ছুটো 100 ফুট তার পাশাপাশি জড়িয়ে মোটা করা হয়েছে। তার বেলায় আমরা ভাবতে পারি ছুটো 1 ওমের রেসিস্ট্যান্স প্যারালালে রয়েছে। তাহলে পুরো রেসিস্ট্যান্স হবে—

$(1 \times 1) \div (1 + 1) = \cdot 5$ ওম রেসিস্ট্যান্স অর্থাৎ মোটা তারের রেসিস্ট্যান্স থেকে কম।

সমান মাপের ছুটো আলাদা ধাতুর তারের রেসিস্ট্যান্স সমান হয় না। সমান মাপের তামার রূপোর ও এ্যালুমিনিয়ামের তারের মধ্যে রূপোর তারের রেসিস্ট্যান্স সব চেয়ে কম, তামার তারের রেসিস্ট্যান্স তার চেয়ে একটু বেশী, এ্যালুমিনিয়াম তারের রেসিস্ট্যান্স আরও অনেক বেশী। রেডিও বা বিছ্যতের কাজে

তাই দুটো রেসিস্ট্যান্সের মধ্যে তার জুড়ে দিতে হলে তামার তার ব্যবহার করা হয়। রূপো দামী বলে রূপো ব্যবহার করা হয় না। বাড়িতে যে ইলেকট্রিক হিটার জ্বলে তার তারের রেসিস্ট্যান্স খুব বেশী। 'নিক্রোম' বলে এক মিশ্র ধাতু নিয়ে এ ধরনের তার তৈরী করা হয়। এ ধরনের তারকে সাধারণতঃ বলে রেসিস্ট্যান্স তার।

একটা ব্যাটারীতে দুটো তামার তার লাগিয়ে আলো জ্বাললে তার দুটো যদি গায়ে গায়ে লেগে যায় তাহলে বাল্‌বের ভেতরে তারের রেসিস্ট্যান্স বেশী বলে বাল্‌বের ভেতর দিয়ে প্রায় কিছুই কারেণ্ট যাবে না। এ ধরনের গায়ে গায়ে তার লেগে যাওয়াকে বিদ্যুতের ভাষায় বলে সারকিট, শর্ট সারকিট হলে বাল্‌ব জ্বলবে না, ব্যাটারীও খামকা খরচ হবে। যাতে শর্ট সারকিট না হয় তার জন্য জুড়ে দেবার তারের উপরে নানারকম ইনস্যুলেটরের আবরণ লাগান হয়। গালা বা শেলাকের বার্নিশ দিয়ে এক ধরনের ইনস্যুলেটর তৈরী করা হয়। এগুলিকে বলে এনামেল-করা তামার তার। রেডিওতে এ ধরনের তার খুব ব্যবহার করা হয়। সিল্কের সুতো বা সাধারণ সুতো জড়িয়ে, রবার বা প্লাস্টিকের আবরণে তৈরী করা আরো নানারকমের ইনস্যুলেট-করা তারের কথা পরে বলবো।

যে কোন রেসিস্ট্যান্সের ভেতর দিয়ে কারেণ্ট গেলে রেসিস্ট্যান্স গরম হয়। যেমন, হিটার বা ইলেক্‌ট্রিক্ বাল্‌বের তারের ভেতর দিয়ে কারেণ্ট গেলে আলো বা তাপ সৃষ্টি করে। প্রত্যেক সেকেণ্ডে তারে যতটুকু তাপের সৃষ্টি হয় তাকে বলে

'ওয়াটেজ'। ওয়াটেজ 'ওয়াটে' মাপা হয়। ওয়াটেজ হিসাব করার নিয়ম হচ্ছে—

$$\text{ওয়াটেজ} = \text{কারেন্ট} \times \text{ভোল্টেজ},$$

ওমের নিয়ম থেকে আমরা জানি—

$$\text{কারেন্ট} = \frac{\text{ভোল্টেজ}}{\text{রেসিস্ট্যান্স}}$$

$$\text{অথবা, ভোল্টেজ} = \text{কারেন্ট} \times \text{রেসিস্ট্যান্স}$$

তাহ'লে, ওয়াটেজের হিসেব আমরা এ ভাবে করতে পারি—

$$\text{ওয়াটেজ} = \frac{(\text{ভোল্টেজ})^2}{\text{রেসিস্ট্যান্স}} \quad \text{অথবা,}$$

$$\text{ওয়াটেজ} = \text{কারেন্ট} \times \text{রেসিস্ট্যান্স}$$

একটা হিসেব দিলে তোমার পক্ষে বোঝা সহজ হবে। ধর, বাড়িতে ইলেক্‌ট্রিক লাইনে ভোল্টেজ হচ্ছে 220 ভোল্ট একটা বাল্‌বের রেসিস্ট্যান্স হচ্ছে 484 ওম। তাহ'লে বাল্‌বের ওয়াটেজ $= (220)^2 \div 484 = 100$ ওয়াট।

৬

কন্‌ডেন্‌সার

বাড়তি টাকা যেমন ব্যাঙ্কে জমিয়ে পরে ইচ্ছেমত খরচ করা যায় তেমনি বিদ্যুৎ জমিয়ে রাখারও ব্যাঙ্ক তৈরী করা যায়। বিদ্যুৎ বিশারদের ভাষায় এ ধরনের যন্ত্রকে বলে 'কন্‌ডেন্‌সার'।

দুটো ধাতুর পাত গায়ে গায়ে না ঠেকিয়ে পাশাপাশি

—16—
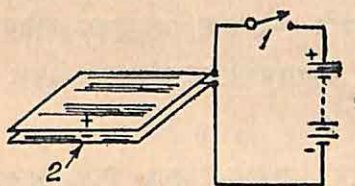
1-স্থইচ্। 2-কনডেনসারের পাত। 1 স্থইচ্‌টি টিপলে ব্যাটারী থেকে বিদ্যুৎ এসে কনডেনসারের পাতে জমবে।

(ছবিতে যে ভাবে দেখান আছে) রাখলে একটা কন্‌ডেন্‌সার তৈরী হল। কি করে কন্‌ডেন্‌সারে বিদ্যুৎ জমিয়ে রাখে সে কথা এবার খুলে বলি।

একটা ব্যাটারী নিয়ে তার দুটো প্রান্ত কন্‌ডেন্‌সারের দুটো পাতে জুড়ে দেওঁয়া হল। ব্যাটারী কিছু ইলেক্‌ট্রনকে লোভ দেখিয়ে নেগেটিভ টারমিনালের সঙ্গে লাগান পাতে

হাজির করলো। তারপর আর ইলেক্‌ট্রনদের এগিয়ে যাবার উপায় নেই। তাহ'লে কন্‌ডেন্‌সারের নেগেটিভ পাতে নেগেটিভ বিদ্যুৎ বেড়ে গেল। তেমনি পজিটিভ পাতের থেকে কিছু ইলেক্‌ট্রন ব্যাটারীর ভেতর দিয়ে নেগেটিভ পাতে চলে আসায় পজিটিভ পাতে পজিটিভ বিদ্যুৎ বেড়ে গেল। ব্যাটারী লাগানর আগে কন্‌ডেন্‌সারের কোন পাতেই বিদ্যুৎ ছিল না। এখন দেখতে পাচ্ছি একটা পাতে পজিটিভ আর একটা পাতে নেগেটিভ বিদ্যুৎ ভর করছে।

এবার তার কেটে দিয়ে কন্‌ডেন্‌সারটাকে যদি ব্যাটারী থেকে আলাদা করে নেওয়া হয় তখনও এই দুটো পাতে পজিটিভ আর নেগেটিভ বিদ্যুৎ থেকে যাবে। পজিটিভ বিদ্যুতের পরিমাণ নেগেটিভ বিদ্যুতের পরিমাণের ঠিক সমান হবে। এভাবে কন্‌ডেন্‌সারের দু'পাতে বিদ্যুৎ জমানোকে বলে 'চার্জ' করা।

কন্‌ডেন্‌সারের জমান বিদ্যুৎ ইচ্ছে করলেই খরচ করে পাতদুটোকে আবার বিদ্যুৎ-শূন্য করে তোলা যায়। একে বলে 'ডিস্‌চার্জ' করা। কন্‌ডেন্‌সারের পাতদুটো তার দিয়ে জুড়ে দিলে সে তারের ভেতর দিয়ে খুব অল্পক্ষণের জন্য কারেণ্ট চলবে পজিটিভ পাত থেকে নেগেটিভ পাতে। অর্থাৎ ইলেকট্রনগুলি নেগেটিভ পাত থেকে পজিটিভ পাতের দিকে চলে যাবে। দুটো পাতের পজিটিভ-নেগেটিভ বিদ্যুতের পরিমাণ সমান ছিল, তাই আবার মিলেমিশে দুটো পাতই বিদ্যুৎ-শূন্য হয়ে যাবে। অর্থাৎ নেগেটিভ পাতে যে ইলেকট্রনগুলি গিয়েছিল তারা আবার নিজের পাতে ফিরে আসবে।

ডিসচার্জের সুরু থেকে শেষ অবধি এই অল্প সময়ের জন্য কন্‌ডেন্‌সারের সাথে লাগান তারের ভেতর দিয়ে কারেণ্ট চলে। তেমনি ব্যাটারী জুড়ে চার্জ করার সময় যতক্ষণ না পুরো চার্জ হচ্ছে ততক্ষণ অল্প সময়ের জন্য পাতে লাগান তারের ভেতর দিয়ে কারেণ্ট চলে।

ছোট বড় পাত দিয়ে, পাতদুটো কাছে রেখে বা দূরে রেখে যদি একই ব্যাটারী দিয়ে তাদের চার্জ করা হয় তখন মাপলে দেখা যাবে কোন কন্‌ডেন্‌সার বেশী বিদ্যুৎ ধরে রেখেছে, কোন কন্‌ডেন্‌সার কম বিদ্যুৎ ধরে রেখেছে। বিদ্যুৎ ধরে রাখার ক্ষমতাটাকে বলা হয় কন্‌ডেন্‌সারের 'ক্যাপাসিটি'। যে কন্‌ডেন্‌সারের ক্যাপাসিটি বেশী তার পাতে তত বেশী বিদ্যুৎ ধরে। পাত বড় হ'লে আর বেশী কাছাকাছি থাকলে ক্যাপাসিটি বেশী হয়।

কন্‌ডেন্‌সারের ক্যাপাসিটি ব্যাটারীর ভোল্টেজ বা পাতের জমান বিদ্যুতের উপর নির্ভর করে না।

আর একভাবে কন্‌ডেন্‌সারের ক্যাপাসিটি খুব বাড়ান যায়। যেমন দুটো পাতের মধ্যে কাঁচ ঢুকিয়ে দিলে ক্যাপাসিটি বাড়ে। তেমনি মোম-মাখান কাগজ। অভ্র বা মাইকা অন্য যে কোন ইন্‌স্যুলেটার দুটো পাতের মাঝখানে ঢুকিয়ে দিলেও ক্যাপাসিটি অনেকখানি বেড়ে যায়।

একই কন্‌ডেন্‌সারকে আলাদা আলাদা ব্যাটারী দিয়ে চার্জ করলে জমান বিদ্যুতের পরিমাণ আলাদা আলাদা হয়। একই কন্‌ডেন্‌সারকে কম আর বেশী ভোল্টেজের ব্যাটারী দিয়ে চার্জ করলে জমান বিদ্যুৎ ভোল্টেজের অনুপাতে কম বা বেশী হয়।

বিদ্যুতের পরিমাণ মাপা হয় 'কুলোম' দিয়ে। এক সেকেণ্ড ধরে এক অ্যামপেয়ার কারেন্ট চললে পর তারের ভেতর দিয়ে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ চলেছে তাকে বলা হয় এক কুলোম।

কন্‌ডেন্‌সারের ক্যাপাসিটি, পাতে জমান বিদ্যুৎ, আর দু'পাতের ভোল্টেজের তফাতের মধ্যে সম্পর্ক হ'ল—

বিদ্যুতের পরিমাণ = ক্যাপাসিটি × ভোল্টেজ)

ক্যাপাসিটির মাপকে বলা হয় 'ফ্যারাড'। ধর, কোন কন্‌ডেন্‌সারের ক্যাপাসিটি যদি হয় 3 ফ্যারাড, 200 ভোল্টের ব্যাটারী দিয়ে যদি তাকে চার্জ করা হয়, তবে প্রত্যেক পাতে জমান বিদ্যুতের পরিমাণ হচ্ছে,

3 ফ্যারাড × 200 ভোল্ট = 600 কুলোম।

চার্জ বা ডিসচার্জ করতে যদি 2 সেকেণ্ড সময় লাগে তাহ'লে বাইরের তার দিয়ে গড়-পড়তা কারেন্ট যাবে—

$$\frac{600 \text{ কুলোম}}{2 \text{ সেকেণ্ড}} = 300 \text{ অ্যাম্‌পেয়ার।}$$

1 ফ্যারাড ক্যাপাসিটির কন্‌ডেন্‌সার অবশ্য খুব বড়। রেডিওতে তার চেয়ে অনেক ছোট কন্‌ডেন্‌সার ব্যবহার করা হয় যাদের ক্যাপাসিটি কয়েক 'মাইক্রোফ্যারাড' বা 'পিকোফ্যারাড'। এক মাইক্রোফ্যারাড হ'ল এক ফ্যারাডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ আর এক পিকোফ্যারাড

হ'ল এক মাইক্রোফ্যারাডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ।

দুটো কন্‌ডেন্‌সার সিরিজে লাগালে তাদের মোট ক্যাপাসিটি তাদের গুণফলকে যোগফল দিয়ে ভাগ করলে যা হয় তাই। দুটো কন্‌ডেন্‌সার প্যারালালে জুড়লে তাদের মোট ক্যাপাসিটি হয় তাদের আলাদা আলাদা ক্যাপাসিটির যোগফল। অর্থাৎ রেসিস্ট্যান্সের বেলায় সিরিজ বা প্যারালালের যে হিসেব এখানে ঠিক তার উল্টো। তাই কন্‌ডেন্‌সারের ক্যাপাসিটি বাড়াতে হ'লে অনেকগুলি পাত (17 নং ছবির মতন) প্যারালালে জুড়ে কন্‌ডেন্‌সার তৈরী হয়।
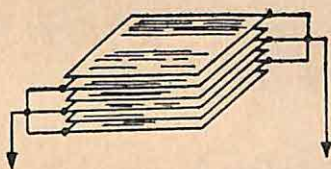
—17—

অনেকগুলি পাত দিয়ে তৈরী করা
বেশী ক্যাপাসিটির কনডেন্‌সার।

কখন কখন একই কন্‌ডেন্‌সারের ক্যাপাসিটি বাড়ানো-কমানো দরকার হয়। দু'ভাবে সেটা করা যেতে পারে। পাত-গুলিকে পাশাপাশি সরিয়ে দিয়ে দু'পাতের মুখোমুখি জায়গা কমিয়ে দিলে ক্যাপাসিটি কমে যায়। রেডিও টিউন করার জন্য এ ধরনের কন্‌ডেন্‌সার ব্যবহার করা হয়। আর এক ধরনের

কন্‌ডেন্‌সারের ধাতুর মাঝখানে অনেকগুলি অভ্রের পাত থাকে। একটা স্ক্রু ঘুরিয়ে ধাতুর পাতদুটোকে কাছাকাছি বা দূরে সরান

যায়। তাতে ক্যাপাসিটি বাড়ে বা কমে। এ ধরনের কন্‌ডেন্‌সারকে বলে ভেরিএব্‌ল্‌ কন্‌ডেন্‌সার, 'ট্রিমার' বা 'প্যাডার'।

৭

চুম্বক

বিদ্যুতের অনেক কথাই তোমাকে বললাম কিন্তু কি করে তারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎকে দূত করে কথা পাঠান যায় সে কথা এখনও বলিনি। বিদ্যুতের সঙ্গে চুম্বকের সম্পর্ক না জানা পর্যন্ত দূতের কাজে বিদ্যুৎকে আমরা ব্যবহার করতে পারি না। তাই চুম্বকের কথা, বিদ্যুৎ আর চুম্বকের মধ্যে কি কি সম্পর্ক রয়েছে সে কথাগুলি এখন তোমাকে বলবো।

চুম্বক লোহা বা ইস্পাতের টুকরোকে কাছে টেনে নেয়। চুম্বকও হচ্ছে এক ধরনের লোহা বা ইস্পাত। যে কোন লোহা বা ইস্পাতকে বরাবর বা অল্পক্ষণের জন্য চুম্বক বানিয়ে নেওয়া যায়।

যে কোন চুম্বককে সুতো দিয়ে ঝুলিয়ে দিলে তার একটা মাথা বরাবর উত্তর দিকে আর একটা দক্ষিণ দিকে থাকে। এই মাথাদুটোকে বলা হয় উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরু। দুটো চুম্বক কাছাকাছি নিলে একটার উত্তরমেরু অন্যটার দক্ষিণমেরুকে কাছে টানে কিন্তু উত্তরমেরু উত্তরমেরুকে আর দক্ষিণমেরু দক্ষিণমেরুকে দূরে ঠেলে দেয়।

একটা চুম্বকের উপরে কাগজ রেখে যদি কাগজের উপর লোহার গুঁড়ো ছড়িয়ে আস্তে আস্তে কাগজে টোকা দাও তাহ'লে দেখবে লোহার গুঁড়োগুলি পর-পৃষ্ঠার (19নং) ছবির

মত চেহারা নিয়েছে। দেখতে পাবে গুঁড়োগুলি কয়েকটা বাঁকা রেখার উপর পরপর সাজান রয়েছে। এই রেখাগুলির ইংরাজী নাম 'লাইনস্ অব ফোর্স'। আমরা বাংলায় বলবো চুম্বকের 'বলরেখা'। লোহার গুঁড়ো না ছড়ালেও চুম্বকের চারপাশে শূন্যের ভেতরে বলরেখাগুলি এভাবে ছড়িয়ে আছে বলে ধরে নেওয়া হয়। পরের পাতার 22 নং ছবিতে বলরেখার গায়ে উত্তরমেরু থেকে দক্ষিণমেরুর দিকে তীরচিহ্ন আঁকা রয়েছে। এর মানে হ'ল, ধরে নেওয়া হয় বলরেখাগুলি চুম্বকের উত্তরমেরু থেকে দক্ষিণমেরুর দিকে যাচ্ছে। যেখানে বলরেখা কাছাকাছি রয়েছে সেখানে চুম্বকের প্রভাব বেশী। যেখানে দূরে দূরে রয়েছে সেখানে
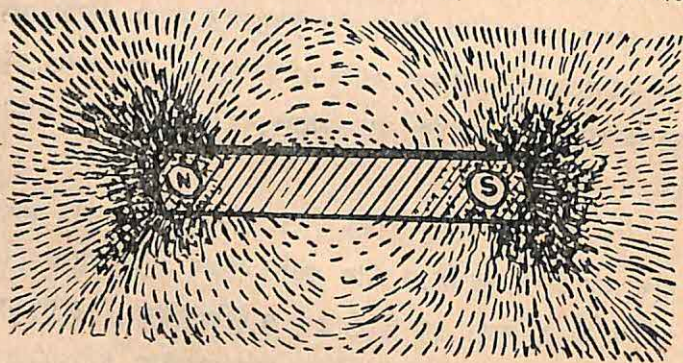
—19—
চুম্বকের বলরেখা

প্রভাব কম। বলরেখা দিয়েই চুম্বকের সব গুণাগুণ বোঝা যায়। কোথাও বলরেখা থাকলে আমরা বলি সেখানে একটা চৌম্বক-ক্ষেত্র বা 'ম্যাগ্‌নেটিক ফিল্ড' রয়েছে।

যে কোন তারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ চললেই তার

চারদিকে চৌম্বক-ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। এটাও বিদ্যুতের একটা
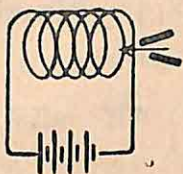
—20—

বিদ্যুৎবাহী তারের কুণ্ডলী চুম্বকের মতো লোহাকে টানে
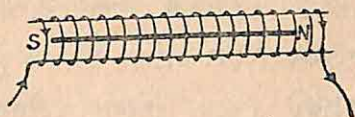
—21—

তারের ভেতর দিয়ে কারেন্ট চললে ভেতরের লোহার কাঠিটি চুম্বক হয়ে যায়
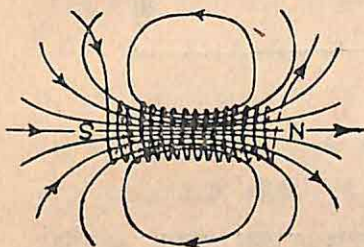
—22—

চুম্বকের মতো তারের কুণ্ডলীরও বলরেখা থাকে
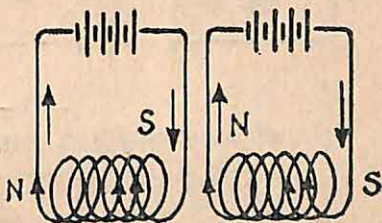
—23—

দুটি বিদ্যুৎবাহী তারের কুণ্ডলী চুম্বকের মত পরস্পরকে আকর্ষণ করতে পারে
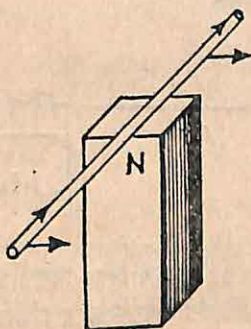
—24—

চুম্বকের কাছে বিদ্যুৎবাহী তার ধরলে, তারটি আড়াআড়ি সরে যেতে চায়

বিশেষ গুণ। তাই যে কোন তারের 'কুণ্ডলী' বা 'কয়েলের' ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ গেলে (20 নং ছবি দেখ) পুরো কুণ্ডলীটায় যতক্ষণ বিদ্যুৎ যাচ্ছে ততক্ষণ চুম্বকের গুণাগুণ দেখা যায়। কারেণ্ট থেমে গেলে চৌম্বক-ক্ষেত্রও আর থাকে না।
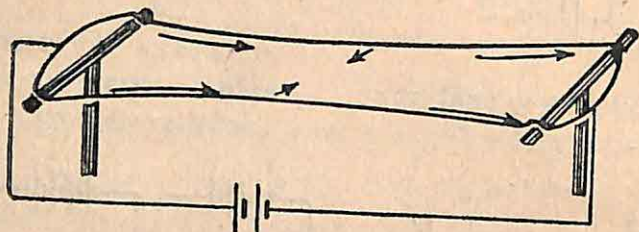
—25—

দুটি সমান্তরাল তারের ভেতর দিয়ে একই দিকে কারেণ্ট চললে তারা পরস্পরকে আকর্ষণ করে

কুণ্ডলীর ভেতর দিয়ে যখন বিদ্যুৎ যাচ্ছে তখন একটা লোহার বা ইস্পাতের ডাণ্ডা ঢুকিয়ে দিলে সেই ডাণ্ডাটাও
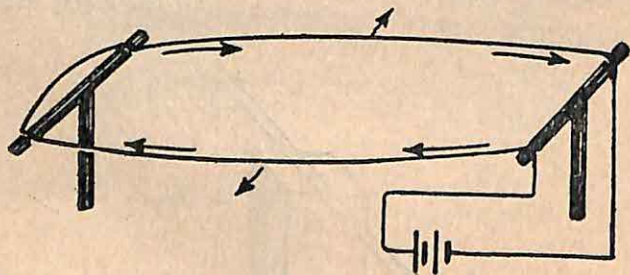
—26—

দুটি সমান্তরাল তারের ভেতর দিয়ে বিপরীত দিকে কারেণ্ট চললে তারা পরস্পরকে দূরে ঠেলে দেয়

চুম্বক হয়ে যাবে (21 নং ছবি দেখ)। একধরনের লোহা বা ইস্পাত আছে যা ততক্ষণই চুম্বক থাকে যতক্ষণ কুণ্ডলীর ভেতর

দিয়ে কারেন্ট চলে। তাদের বলে 'অস্থায়ী চুম্বক'। আবার একধরনের লোহা বা ইস্পাত একবার চুম্বক হ'লে বরাবরই চুম্বক থেকে যায়। এদের বলে 'স্থায়ী চুম্বক'।

বিদ্যুৎ চললেই চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরী হয় বলে দুটো বিদ্যুৎবাহী তার বা তারের কুণ্ডলী চুম্বকের মত পরস্পরকে কাছে টানে বা দূরে ঠেলে দেয়। কাছে টানবে না দূরে ঠেলে দেবে তা নির্ভর করে বিদ্যুৎ কোন্ তারে কোন্ দিকে যাচ্ছে তার উপর (23 নং ছবি দেখ)। কতখানি জোরে কাছে টানবে বা দূরে ঠেলবে তা নির্ভর করে কারেন্টের উপর। কারেন্ট বেশী হ'লে জোর বেশী হবে, কারেন্ট কম হ'লে জোর কম হবে। তেমনি একটা তারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ গেলে সেই তারটা যদি কোন চুম্বকের কাছে থাকে তবে চুম্বকটা তারটাকে আড়াআড়ি ভাবে কাছে টানে বা দূরে ঠেলে দেয় (24 নং ছবি দেখ)।

বিদ্যুতের সঙ্গে চুম্বকের সম্পর্ক নিয়ে এক পিঠ বলা হ'ল, আর এক পিঠ বলা বাকি। কারেন্ট দিয়ে যেমন চৌম্বক-ক্ষেত্র সৃষ্টি করা যায় তেমনি চৌম্বক-ক্ষেত্র দিয়ে ব্যাটারী ছাড়াও যে কোন সারকিটে কারেন্ট তৈরী করা যায়।

পর-পর খালি তার জুড়ে সারকিট তৈরী করলে সে সারকিটে ব্যাটারী না থাকলে কারেন্ট হয় না। কিন্তু যদি কাছে একটা চুম্বককে খুব তাড়াতাড়ি এদিক ওদিক নড়ান যায় তবে আপনা থেকেই সারকিটে কারেন্ট সৃষ্টি হতে পারে। এ ধরনের কারেন্ট সৃষ্টি করাকে বলা হয় 'ইনডাকশন' (Induction)।

27 নং ছবিতে একটা তারের কুণ্ডলীর সাথে মিলিঅ্যামিটার

জুড়ে সারকিট তৈরী করা হয়েছে। এবার যদি খুব তাড়াতাড়ি একটা চুম্বককে কুণ্ডলীর কাছে আনা যায় তাহ'লে মিলিঅ্যামিটারের কাঁটা নড়ে উঠবে অর্থাৎ সারকিটে আপনা থেকে একটা ভোল্টেজ সৃষ্টি হবে এবং তার জন্য কারেণ্ট চলবে। কিন্তু এই কারেণ্ট ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ চুম্বকটা নড়ছে। চুম্বক থেমে গেলে কারেণ্ট থাকে না। কাঁটা নিজের জায়গায় ফিরে আসে। এবার যদি চুম্বকটাকে আবার কুণ্ডলীর কাছ থেকে তাড়াতাড়ি দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়—তখন আবার আগের মত অল্পক্ষণ স্থায়ী কারেণ্ট সৃষ্টি হবে কিন্তু এবার—মিলিঅ্যামিটারের কাঁটা নড়বে উল্টো দিকে। অর্থাৎ এবার কারেণ্ট আগের বারের উল্টোদিকে যাচ্ছে।
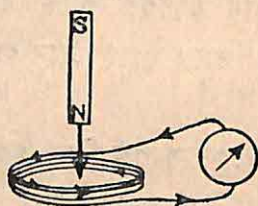
—27—

ইনডাকশনের ব্যাপারে নানারকম পরীক্ষা করে একথাগুলি জানা গেছে—

• যে কোন সারকিটে তারের কুণ্ডলীর ভেতর দিয়ে যাওয়া চৌম্বক-ক্ষেত্রের বলরেখার সংখ্যা কমলে বা বাড়লে সেই সারকিটে আপনা থেকে একটা ভোল্টেজ সৃষ্টি হয়।

• বলরেখা বাড়লে যে দিকে কারেণ্ট হবে, বলরেখা কমলে তার উল্টো দিকে কারেণ্ট হবে।

• বলরেখার সংখ্যা যত তাড়াতাড়ি বাড়ে কমে ভোল্টেজ ততই বেশী হয়।

• কুণ্ডলীর তারের পাকের সংখ্যা বেশী হলে ভোল্টেজ বেশী হয়।

একটা চুম্বককে ক্রমাগত একটা সারকিটের কাছে দূরে আনতে নিতে থাকলে সেই সারকিটে বরাবর কারেণ্ট চলবে। কিন্তু এই কারেণ্ট বরাবর কমবে, বাড়বে আর দিক বদলাবে। এ ধরনের কারেণ্টকে বলা হয় 'দিকফিরতি কারেণ্ট' বা এ. সি (Alternating current)। ব্যাটারী লাগিয়ে যে কারেণ্ট পাওয়া যায় তা বরাবরই একই দিকে চলে। তাকে বলা হয় ডি. সি. (Direct current)।

চুম্বকের বদলে একটা বিদ্যুৎবাহী তারের কুণ্ডলী দিয়েও ইন্‌ডাক্‌শন করা যায়। এই কুণ্ডলীকে আমরা বলবো 'প্রাইমারী' ও যে-কুণ্ডলীতে 'ইন্‌ডাক্‌শন' হবে তাকে বলবো 'সেকেণ্ডারী'। প্রাইমারীর ভেতর দিয়ে কারেণ্ট গেলে সে
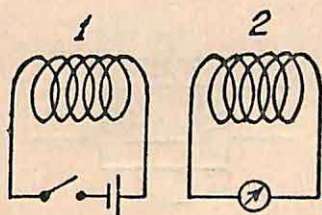
—28—
1—কুণ্ডলীটির স্বইচ টিপলে 2—কুণ্ডলীটিতে আপনা থেকেই ক্ষণকালস্থায়ী কারেণ্ট সৃষ্টি হবে।

কুণ্ডলীটা চুম্বকেরই সামিল সে কথা তুমি জান। প্রাইমারী দিয়ে নানারকম ভাবে ইন্‌ডাকশন করা যেতে পারে ; যেমন—

* চুম্বকের মত কাছে দূরে দিয়ে
* প্রাইমারীর কারেণ্ট বাড়িয়ে-কমিয়ে—কারণ প্রাইমারীর কারেণ্ট বাড়লে কমলে চৌম্বক-ক্ষেত্রেরও বলরেখার সংখ্যা বাড়ে কমে।

প্রাইমারীতে ডি. সি. চললে এমনিতে সেকেণ্ডারীতে কোন ভোল্টেজ হয় না। প্রাইমারীর সুইচ 'অন্' বা 'অফ্' করার সময় চৌম্বক-ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় ও মিলিয়ে যায় বলে মুহূর্তের জন্য সেকেণ্ডারীতে ইন্‌ডাক্‌শন হয়। 'অন' বা 'অফ' করার সময় ছাড়া একই জোরের ডি. সি. চলতে থাকে, তাই চৌম্বক-ক্ষেত্রের বলরেখার সংখ্যার পরিবর্তন হয় না বলে কোন ইন্‌ডাক্‌শন হয় না। কিন্তু প্রাইমারীতে এ. সি. চললে চৌম্বক-ক্ষেত্রের বলরেখার সংখ্যার সবসময় পরিবর্তন হচ্ছে বলে ইন্‌ডাক্‌শন হয়।

পাশাপাশি দুটো কুণ্ডলী রেখে এভাবে একটা থেকে আর একটাতে এ. সি. ইন্‌ডাক্‌শন করার ব্যবস্থাকে বলে
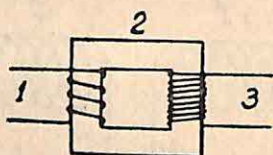
—29—

ট্রান্সফর্মার। 1—প্রাইমারী, 2—লোহার 'কোর', 3—সেকেণ্ডারী

'ট্রান্সফর্মার'। প্রাইমারীর ভোল্টেজের তুলনায় সেকেণ্ডারীর ভোল্টেজ ইচ্ছেমত কম বেশী করা যেতে পারে। সাধারণত

কুণ্ডলী ছুটো জড়ান হয় একটা লোহার উপরে যাকে বলা হয় 'কোর' বা 'আরমেচার'।

সেকেণ্ডারীর পাকের সংখ্যা যদি প্রাইমারীর পাকের সমান হয় তাহলে সেকেণ্ডারীর ভোল্টেজ প্রাইমারীর ভোল্টেজের সমান হবে। সেকেণ্ডারীর পাক দ্বিগুণ হ'লে ভোল্টেজ দ্বিগুণ হবে, অর্ধেক হ'লে ভোল্টেজ অর্ধেক হবে।

সেকেণ্ডারীতে কারেণ্ট কত হবে তা নির্ভর করে

—30—
ট্রান্সফর্মারের চেহারা এই ধরনের।

—31—
পাশের ছবির ট্রান্সফর্মারের 'কোর' এরকম লোহার পাত দিয়ে (E এবং I) দিয়ে তৈরী।

সেকেণ্ডারীর পুরো রেসিস্ট্যান্সের উপরে। সেকেণ্ডারীর রেসিস্ট্যান্স কমিয়ে কারেণ্ট বাড়িয়ে দিলে প্রাইমারীর কারেণ্ট
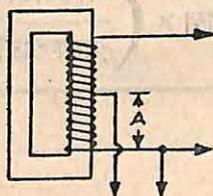
—32—
অটোট্রান্সফর্মার। এ ধরনের ট্রান্সফর্মারে একই কুণ্ডলীর একটি অংশ (A) প্রাইমারী এবং পুরো কুণ্ডলীটি সেকেণ্ডারী; সেকেণ্ডারীর পাকের সংখ্যা প্রাইমারীর পাকের যতগুণ সেকেণ্ডারীর ভোল্টেজ ও প্রাইমারীর ভোল্টেজের ঠিক ততগুণ।

আপনা থেকে বেড়ে যায়। অর্থাৎ যেন আপনা থেকে প্রাইমারীর রেসিস্ট্যান্স কমে গেছে। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, প্রাইমারীর রেসিস্ট্যান্স, সেকেণ্ডারীর রেসিস্ট্যান্সের উপর নির্ভর করছে। প্রাইমারীর এই ফালতু রেসিস্ট্যান্সকে ইংরাজীতে বলে 'রিফ্‌লেক্‌টেড রেসিস্ট্যান্স'।
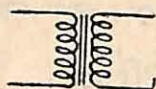
লোহার 'কোরে' জড়ান ট্রান্সফর্মারের চিহ্ন
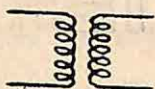
ট্রান্সফর্মার কিন্তু এতে লোহার 'কোর' নেই

—33—

রিফ্‌লেক্‌টেড্ রেসিস্ট্যান্স =

$$\text{সেকেণ্ডারীর রেসিস্ট্যান্স} \times \left(\frac{\text{প্রাইমারীর পাকের সংখ্যা}}{\text{সেকেণ্ডারীর পাকের সংখ্যা}}\right)^2$$

৮

রিয়্যাক্‌ট্যান্‌স্‌, ইম্‌পিডেন্‌স্‌

এ. সি. বা দিকফিরতি বিদ্যুতের বেলায় প্রত্যেক দু'বার দিক পরিবর্তনকে একটা সাইক্‌ল্‌ বলা হয়। এক সাইক্‌লে তারের যে কোন দু'বিন্দুর মধ্যে ভোল্টেজের তফাৎ ক্রমাগত বাড়ে, কমে ও দিক বদলায়। অর্থাৎ যেদিকটা আগে পজিটিভ ছিল সেদিকটা খানিকক্ষণ পরে নেগেটিভ হয়। যে দিকটা নেগেটিভ ছিল সে দিকটা পজিটিভ হয়। কারেণ্টের বেলায়ও ঠিক তাই। দিক বদলানোর সময়—ভোল্টেজ বা কারেণ্ট
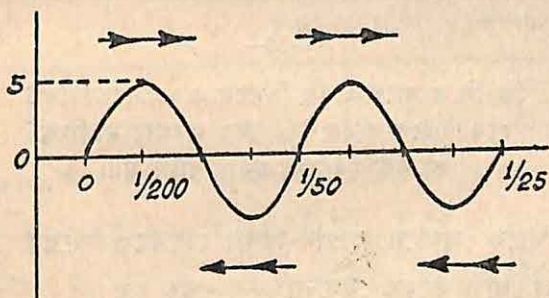
—34—

50 সাইক্‌ল্‌, এ. সি.। তীর-চিহ্ন দিয়ে কারেণ্ট চলার দিক দেখান হয়েছে। 0 থেকে 1/100 সেকেণ্ড পর্যন্ত কারেণ্ট তারের ভিতর দিয়ে যে দিকে যাচ্ছে তার পরের 1/100 সেকেণ্ডে কারেণ্ট তার উল্টো দিকে যাচ্ছে। কারেণ্ট উল্টো দিকে যাচ্ছে বোঝানোর জন্যে গ্রাফের ঐ অংশটা নীচের দিকে আঁকা হয়েছে।

শূন্য হয়ে যায়। আগের ছবিতে (34) এ. সি.'র গ্রাফ দেখলে কথাটা পরিষ্কার বুঝতে পারবে।

এ. সি. -তে সেকেণ্ডে যত সাইক্‌ল্ হয় তাকে বলে এ. সি.'র কম্পন-সংখ্যা। বাড়ির ইলেকট্রিক লাইনে যে এ. সি. বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় তার কম্পন-সংখ্যা সেকেণ্ডে পঞ্চাশ সাইক্‌ল্। রেডিওর সারকিটের অনেক জায়গাতে এ. সি.
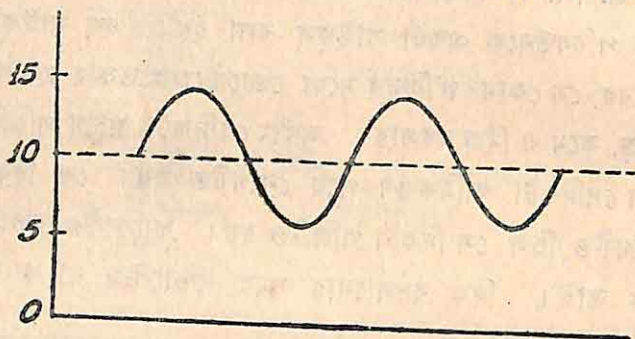
—35—

ডি. সি.'র সাথে এ. সি. মিশলে এ ধরনের কারেণ্ট হবে। এতে কারেণ্টের দিক বদলায় না কিন্তু কারেণ্ট সব সময় সমান থাকে না।

বিদ্যুৎ থাকে সেখানে কম্পন-সংখ্যা সেকেণ্ডে কয়েক কিলো-সাইক্‌ল্ থেকে কয়েক মেগাসাইক্‌ল্ পর্যন্ত হয়।

ডি. সি.'র বেলাতে কোন তারের কুণ্ডলীর রেসিস্ট্যান্স যা হয় এ. সি.'র বেলাতে তার চেয়ে অনেক বেশী হয়। কারণটা বোঝা খুব সহজ। কুণ্ডলীর বেলাতে প্রত্যেক পাক প্রাইমারী হয়ে অন্য পাকগুলিতে ইন্‌ডাক্‌শনের দরুন কারেণ্ট সৃষ্টি করে। এই কারেণ্ট সব সময় প্রাইমারী কারেণ্টের উল্টো দিকে

হয়। তার ফলে মোট কারেণ্টের পরিমাণ কমে যায়। কারেণ্ট কমে যাওয়া মানে রেসিস্ট্যান্স বেড়ে যাওয়া। কারেণ্ট যত ঘন ঘন দিক বদলায় ইন্ডাক্শন তত বেশী হয়। রেসিস্ট্যান্সও তত বেশী হয়। অর্থাৎ কম্পন-সংখ্যা বাড়লে রেসিস্ট্যান্স বাড়ে। এ ধরনের ফালতু এ. সি. রেসিস্ট্যান্সকে বলে 'রিয়্যাক্ট্যান্স্'। এখানেও ওমের নিয়ম খাটে। অর্থাৎ ভোল্টেজ = রিয়্যাকট্যান্স্ × কারেণ্ট। যে কোন কুণ্ডলীর রিয়্যাক্ট্যানস্ জানতে হলে তার—লম্বা, চওড়া মাপ ও পাকের সংখ্যা প্রথমে জানতে হবে। এগুলি থেকে একটা সংখ্যা হিসেব করা হয় তাকে বলে কুণ্ডলীর 'ইন্ডাক্ট্যান্স্'।

ইন্ডাক্ট্যান্স্ হিসেব করার নিয়ম পরে বলবো।

কুণ্ডলীর রিয়্যাক্ট্যান্স্ = 6.28 $(=2\pi)$ × ইন্ডাক্ট্যান্স্ × কম্পন-সংখ্যা।

ইনডাক্ট্যান্সের মাপের নাম হ'ল 'হেনরী' আর রিয়্যাক্ট্যান্সের মাপ হ'ল ওম, রেসিস্ট্যান্সের মত।

কন্ডেন্সারের বেলাতেও ডি. সি. এ. সি.-তে খানিকটা তফাৎ আছে। কন্ডেন্সারের ছ'পাতের মধ্যে ইনস্যুলেটর থাকে বলে কন্ডেন্সারের ভেতর দিয়ে এমনিতে কোন কারেণ্ট যায় না। ডি. সি.'র বেলাতে শুধু চার্জ বা ডিসচার্জ করার সময় বাইরের তারে অল্পক্ষণের জন্য কারেণ্ট চলে। কিন্তু এ. সি.'র বেলাতে প্রতিমুহূর্তে ভোল্টেজ পরিবর্তন হয় বলে কন্ডেন্সারের পাতে বিদ্যুতের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ে ও কমে; অর্থাৎ কন্ডেন্সারটা

বরাবর চার্জ ও ডিসচার্জ হচ্ছে ভাবতে পারো। তার ফলে কন্‌ডেন্‌সারের সঙ্গে লাগান বাইরের তারের ভেতর দিয়ে বরাবর কারেন্ট চলে। এর থেকে একথা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে ক্যাপাসিটি বেশী হ'লে বা এ. সি.'র কম্পন-সংখ্যা বেশী হলে কন্‌ডেন্‌সার-লাগান সারকিটে কারেন্ট বেশী হয়। অর্থাৎ কনডেনসারের রিয়্যাক্‌ট্যান্‌স্ কম হয়।

$$\text{কনডেনসারের রিয়্যাক্‌ট্যান্‌স্} = \frac{1}{6{\cdot}28 \times \text{ক্যাপাসিটি} \times \text{কম্পন-সংখ্যা}}$$

ডি. সি.'র বেলাতে শুধু 'চার্জ বা 'ডিস্‌চার্জ' করার সময় ছাড়া কন্‌ডেন্‌সারের সঙ্গে লাগান বাইরের তারের ভেতর দিয়ে কারেন্ট চলে না।

রেসিস্ট্যান্সের ভেতর দিয়ে কারেন্ট গেলে তাপের সৃষ্টি হয় কিন্তু শুধু রিয়্যাক্‌ট্যান্‌সের জন্য কুণ্ডলী বা কন্‌ডেন্‌সারে কোন তাপের সৃষ্টি হয় না।

কন্‌ডেন্‌সার, রেসিস্ট্যান্স, ইন্‌ডাক্‌ট্যান্‌স্ সব-কিছু সারকিটে থাকলে তাদের মোট বাধাকে বলে 'ইম্‌পিডেন্‌স্'। ইম্‌পিডেন্‌স্ হিসেব করার নিয়মটা জটিল। বইয়ের শেষে পাবে।

লোহার আরমেচারের উপর জড়ান কুণ্ডলীর ইন্‌ডাক্‌ট্যান্‌স্ অনেক বেশী হয়। অযথা তাপসৃষ্টি হয়ে বাড়তি বিদ্যুৎ-শক্তি খরচ হয় না বলে এ. সি. পাখার রেগুলেটারে এ ধরনের লোহার উপর জড়ান ইন্‌ডাক্‌ট্যান্‌স্ পাখার সঙ্গে সিরিজে

লাগান থাকে। ডি. সি'র পাখার রেগুলেটারে ইন্‌ডাক্‌ট্যানস্‌ ব্যবহার করে লাভ নেই বলে শুধু রেসিস্ট্যান্স ব্যবহার করা হয়। রেডিওর চলতি ভাষায় ইন্‌ডাক্‌ট্যান্‌সের নাম হচ্ছে 'চোক্‌'।
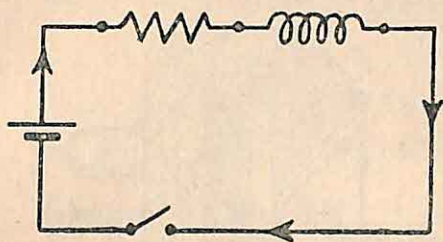
—26—

এই সারকিটের সুইচ টিপলে প্রথমে কারেণ্ট খুবই কম হবে, তারপর ক্রমশঃ বাড়বে। কারেণ্ট চলতি অবস্থায় ব্যাটারীর দু'মাথা 'শর্ট' করে দিলে কারেণ্ট তখনই বন্ধ হবে না, ক্রমশঃ কমবে। কুণ্ডলীর ইন্‌ডাক্‌ট্যান্‌স্‌ থাকার জন্য এ রকম হয়।

৯

মাইক্রোফোন—টেলিফোন

বিদ্যুতের মোটামুটি পরিচয় তোমাকে দিলাম। কি করে কথা পাঠান যায় সে-কথাটা এবার বলার সময় হয়েছে।
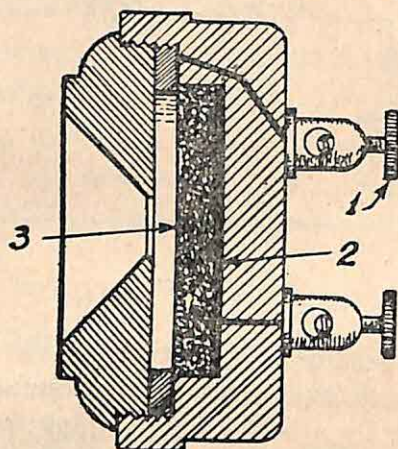
—37—

কার্বন মাইক্রোফোন। 1—টারমিনাল, 2—কার্বন বা কয়লার গুঁড়ো, 3—ধাতুর পাত।
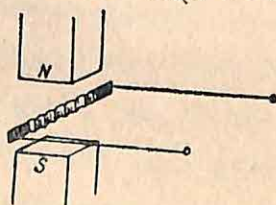
—38—

রিবন মাইক্রোফোন। চুম্বকের দুই মেরুর মধ্যে বসান ধাতুর পাতলা রিবন কাঁপলে ইন্‌ডাক্‌শনের ফলে রিবনের দু'মাথায় দিকফিরতি ভোল্টেজ সৃষ্টি হয়।

একটা বিদ্যুতের তারের সামনে দাঁড়িয়ে তুমি যতই চিৎকার কর না কেন বিদ্যুৎ তোমার কথা বয়ে নিয়ে যাবে না। কথা পাঠাতে হ'লে একটা যন্ত্রের দরকার। তার নাম হ'ল মাইক্রোফোন। তেমনি কথা শোনার জন্য আর একটা যন্ত্রের দরকার তার নাম টেলিফোন। মাইক্রোফোন ও টেলিফোনের ভেতরকার খুঁটিনাটি 37, 38 এবং 39 নং ছবিতে আঁকা হয়েছে।

মাইক্রোফোনের কাজ হ'ল শব্দের কম্পনকে অবিকল সেইরকম কম্পনের কারেণ্টে রূপান্তরিত করা। প্রথম ছবিটা হ'ল কার্বন মাইক্রোফোনের (37)। এই মাইক্রোফোনে দুটো
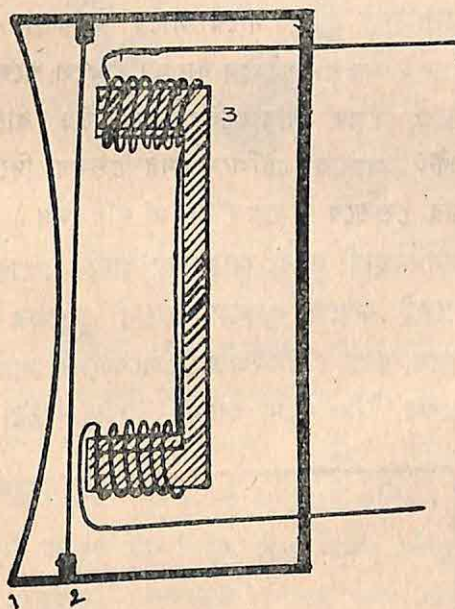
—39—

টেলিফোন। 1—ছিদ্র-করা ঢাকনী। 2—লোহার পাত। 3—অস্থায়ী চুম্বক।

ধাতুর পর্দার মধ্যে কার্বনের গুঁড়ো থাকে। এই দুটো পাত থেকে দুটো তার বেরিয়ে গেছে। এই দুটো তারের সঙ্গে সিরিজে একটা টেলিফোন ও ব্যাটারী জুড়ে দিলে কথা বলার যন্ত্র তৈরী হ'ল (40 নং ছবি)। ব্যাটারী থাকার দরুন মাইক্রোফোনের কয়লার বা কার্বনের গুঁড়ো ও টেলিফোনের ভেতর দিয়ে কারেণ্ট চলে। আমি যখন মাইক্রোফোনের সামনে কথা বলি তখন শব্দের ঢেউ মাইক্রোফোনের সামনের পাতকে কাঁপায়। এই পর্দা কাঁপতে থাকলে কয়লার গুঁড়োকে ক্রমাগত কম-বেশী চাপ দেয়। পর্দার চাপে কয়লার গুঁড়োগুলি কমবেশী ঠাসাঠাসি হয়ে গায়ে গায়ে লাগলে সারকিটের রেসিস্ট্যান্স সেই অনুপাতে কমে বাড়ে। ফলে শব্দের ঢেউয়ের কাঁপুনির সঙ্গে সঙ্গে সারকিটের কারেণ্টও বাড়ে, কমে। এই কারেণ্টই আবার টেলিফোনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। টেলিফোনের ভেতরে থাকে (39 নং ছবি দেখ) সরু তারের কুণ্ডলী জড়ান অস্থায়ী চুম্বক, আর তার সামনে লোহার পাতলা পাত। কারেণ্ট কমলে বাড়লে অস্থায়ী চুম্বকের জোর সেই অনুপাতে কমে, বাড়ে। সেইজন্য টেলিফোনের লোহার পাতের উপরে চুম্বকের টান কমে, বাড়ে। তাই পাতটা সেই ভাবে
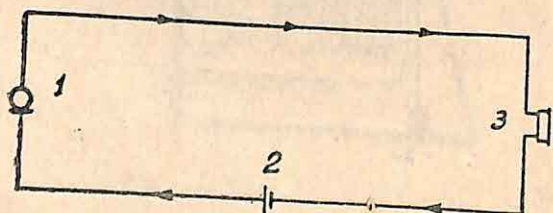
—40—
1—কার্বন মাইক্রোফোন, 2—ব্যাটারী, 3—টেলিফোন।

কাঁপতে থাকে ও পাতের সামনে বাতাসে শব্দের ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। তুমি টেলিফোনে কান রাখলে, আমি মাইক্রোফোনে যে-কথা বলি, অবিকল সেই কথাই শুনতে পাও।

মাইক্রোফোন, টেলিফোনের সুবিধা হচ্ছে যে কারেন্ট অনেকদূর পাঠান যায় বলে অনেকদূরে কথা পাঠান যায়।

—41—

হেডফোন। দুটি টেলিফোনের সাথে মাথায় লাগাবার বাঁকানো পাত রয়েছে।

রেডিওতে, মিটিংয়ে বা পাড়ার বারোয়ারী পূজোয় টেলিফোনের বদলে লাউড-স্পিকার ব্যবহার করা হয়। লাউড-স্পিকারে টেলিফোনের পর্দার বদলে ফাইবার বা কাগজের তৈরী চোঙের আকারের পর্দা থাকে (42 নং ছবি)। লাউড-স্পিকারের পর্দা অনেক বড় থাকে বলে শব্দের জোর অনেক বেশী হয়। চোঙের সরু দিকটাতে চোঙের সঙ্গে একটা শক্ত কাগজের নল লাগান রয়েছে। নলের উপরে সরু তারের কুণ্ডলী জড়িয়ে শক্ত করে আটকান রয়েছে। সমস্ত তারের কুণ্ডলীটা

থাকে একটা বিশেষ আকারের তৈরী চুম্বকের মাঝখানে। কুণ্ডলীর ভেতর দিয়ে কারেন্ট গেলে চৌম্বক-ক্ষেত্রে রয়েছে বলে তার জড়ান নলটা সামনে পিছনে নড়তে চায়। ক্রমাগত কারেন্ট গেলে কুণ্ডলী ও তার সঙ্গে লাগান কাগজের চোঙ
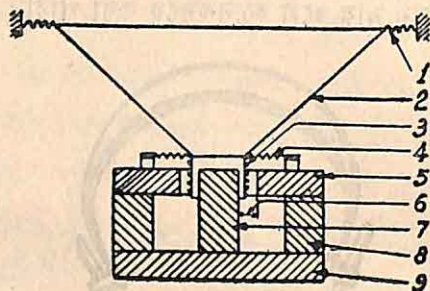
—12—

লাউড-স্পিকার। **1**—ফাইবার কাগজের স্প্রিং, 2—কাগজের চোঙ, 5, 7, 8, 9—স্থায়ী চুম্বকের বিভিন্ন অংশ, 6—কাগজের নলে জড়ান কুণ্ডলী।

সেই অনুপাতে সামনে পেছনে কাঁপে ও তাতে বাইরে শব্দের ঢেউ সৃষ্টি হয়।

মাইক্রোফোনের কারেণ্টে কিন্তু লাউড-স্পিকার কাজ করে না। টেলিফোনে শব্দ পেতে হ'লে যতখানি কারেন্ট দরকার লাউড-স্পিকারে তার চেয়ে অনেক বেশী কারেন্ট দরকার। মাইক্রোফোনের কারেণ্টের জোর 'অ্যাম্প্লিফায়ার' বলে এক ধরনের সারকিট দিয়ে বাড়িয়ে নিলে তবে তা দিয়ে লাউড-স্পিকার চালান যায়। রেডিওর ভেতরেও অ্যাম্প্লিফায়ার সারকিট থাকে। তার কথা তোমাকে পরে বলবো।

১০
বিদ্যুতের ঢেউ

আমি বেশ বুঝতে পারছি যে তুমি মনে মনে বলছো— ধান ভানতে যে শিবের গীতই গাইছেন। রেডিওর কথাটা যে চাপা পড়ে গেছে সে খেয়াল আছে? বিদ্যুতের বাকী কথাবার্তা না হয় আর একদিন শুনবো, রেডিওর কথাটা ভেঙে বলুন তো এবার।

রেডিওর কথা বলতেই তো এত কথা পাড়লাম। বর্ণ পরিচয় না হ'লে যেমন বই পড়া যায় না তেমনি বিদ্যুতের সব কথা না জানলে রেডিওর ব্যাপারও বোঝা যায় না। বিদ্যুতের অনেক কথা এতক্ষণ বললাম। আরো দু'চার কথা বলার রয়েছে। সেগুলো না বলা পর্যন্ত রেডিওর কথা মুলতুবি থাক।

আচ্ছা, আলোর ঢেউয়ের কথায় বইয়ের গোড়াতে কি কি বলেছিলাম, মনে আছে? বলেছিলাম, আলো হচ্ছে বিদ্যুতের ঢেউ যা শূন্যের ভেতর দিয়ে আপনিই যেতে পারে। আরো বলেছিলাম, আলোর ঢেউয়ের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য খুবই কম, কিন্তু এই ধরনের বিদ্যুতের ঢেউয়ের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কয়েক মিটার বা তার বেশী হলে তাকে দূতের কাজে লাগান যায়।

কিন্তু বিদ্যুতের ঢেউ সৃষ্টি হয় কি করে? এর এক কথায় উত্তর হচ্ছে—ইলেক্ট্রনরা ছুটোছুটি করলে। কথাটা ভাল

করে খেয়াল করো, **ছুটলে নয়, ছুটোছুটি করলে** অর্থাৎ ইলেক্‌ট্রনরা যদি তারের ভেতর খানিকক্ষণ এদিক, তারপর কিছুক্ষণ ওদিকে চলতে থাকে তবেই আপনা থেকে শূন্যে বিদ্যুতের ঢেউ হয়। অর্থাৎ কোন তারের ভেতর দিয়ে দিক-ফিরতি কারেণ্ট চলতে থাকলে তা থেকে শূন্যে বিদ্যুতের ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। এই কারেণ্টের জোর নির্ভর করে দিকফিরতি কারেণ্টের জোর আর কম্পন-সংখ্যার উপর। কম্পন-সংখ্যা বেশী হ'লে ঢেউ জোরালো হয়। কম্পন-সংখ্যা কম হ'লে বিদ্যুতের ঢেউয়ের জোর এত কম হয় যে তাকে কোন কাজে লাগান যায় না, তাই বিদ্যুতের ঢেউ তৈরী করতে হ'লে প্রথমেই দরকার উঁচুহারের কম্পন-সংখ্যার দিকফিরতি কারেণ্ট তৈরী করা। পরমাণু থেকে আলোর ঢেউ এভাবেই তৈরী হয়, পরমাণুর ভেতরে খুব তাড়াতাড়ি ইলেক্‌ট্রনরা ছুটোছুটি করলে।

জলের ঢেউ বা শব্দের ঢেউয়ের রূপটা কল্পনা করা সহজ। কিন্তু বিদ্যুতের ঢেউয়ের চেহারাটা কল্পনা করা ততটা সহজ নয়। আপাততঃ এইটুকু জানলেই চলবে যে শব্দের ঢেউয়ের বেলা যেমন আলাদা আলাদা জায়গায় কম-বেশী চাপের সৃষ্টি হয় তেমনি বিদ্যুতের ঢেউয়ের বেলায় শূন্যের মধ্যে আলাদা আলাদা জায়গায় কম-বেশী বৈদ্যুত-ক্ষেত্র ও চৌম্বক-ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়।

সব ঢেউয়ের ঝোঁক হচ্ছে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার। বিদ্যুতের ঢেউও তেমনি যেখানে ইলেক্‌ট্রনরা নাচানাচি করছে বা দিকফিরতি কারেণ্ট চলছে সেখান থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু উঁচুহারের কম্পন-সংখ্যার দিকফিরতি কারেণ্ট তৈরী করা যায় কি করে? সে কথা খানিক পরে বলবো। আপাতত কন্‌ডেন্‌সার ডিস্‌চার্জ হবার ব্যাপারটা আরো একটু খুলে বলি।

মনে কর, একটা চার্জ-করা কন্‌ডেন্‌সারের প্যারালালে একটা রেসিস্ট্যান্স জুড়ে দেওয়া হ'ল। চার্জ-করা কন্‌ডেন্‌সারের দুটো পাতের মধ্যে ভোল্টেজের তফাৎ রয়েছে। তাই রেসিস্ট্যান্স জুড়ে দিলেই তার ভেতর দিয়ে কারেণ্ট চলতে শুরু করে। কারেণ্ট চললে কন্‌ডেন্‌সারের জমান বিদ্যুৎ ক্রমাগতই কমতে থাকে। বিদ্যুৎ কমলে কন্‌ডেন্‌সারের ভোল্টেজও কমতে থাকে। তার ফলে রেসিস্ট্যান্সের ভেতর দিয়ে যাওয়া কারেণ্টও কমতে থাকে। খানিকক্ষণ পরে কন্‌ডেন্‌সারের কোন পাতেই বিদ্যুৎ থাকে না, কারেণ্টও থেমে যায়।

কারেণ্ট চলার অর্থাৎ কন্‌ডেন্‌সার ডিসচার্জ হবার পুরো সময়টা নির্ভর করে কন্‌ডেন্‌সারের ক্যাপাসিটি আর রেসিস্ট্যান্সের উপর। ক্যাপাসিটি বেশী হলে কন্‌ডেন্‌সারের পাতে অনেক বেশী বিদ্যুৎ ধরে, কারেণ্ট ও অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়। রেসিস্ট্যান্স বেশী হলে কারেণ্ট কম হয় বলে বিদ্যুতের পরিমাণ তাড়াতাড়ি কমে না। তখনও কারেণ্ট বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়।

রেসিস্ট্যান্সের বদলে কন্‌ডেন্‌সারের প্যারালালে একটা তারের কুণ্ডলী বা ইন্‌ডাক্‌ট্যান্স জুড়ে দিলে খুব মজার ব্যাপার হয়। তারের কুণ্ডলীর গুণাগুণ নিশ্চয় তোমার মনে আছে,

—43—
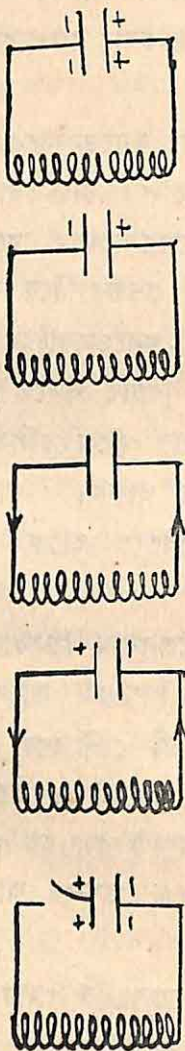
চার্জ-করা কন্‌ভেন্‌সারের প্যারালালে তারের কুণ্ডলী লাগালে আপনা থেকেই দিকফিরতি কারেণ্ট তৈরী হয়।

প্রথম ছবিতে সুইচ টিপবার আগের অবস্থা দেখানো হয়েছে। তার পরের ছবিগুলিতে পরপর কন্‌ডেন্‌সারের ডিস্‌চার্জ এবং তারপর উল্টো দিকে চার্জ হবার অবস্থা দেখানো হয়েছে।

তারের কুণ্ডলীর ভেতর দিয়ে কারেণ্ট সহজে বাড়তে চায় না বা কমতে চায় না। চার্জ-করা কন্‌ডেন্‌সারের সঙ্গে জুড়বার আগে কুণ্ডলীর তারে কোন কারেণ্ট ছিল না। জুড়বার পর প্রথমে কারেণ্ট হবে খুব কম। তারপর কারেণ্ট বাড়তে থাকবে, তার সাথে সাথে কন্‌ডেন্‌সারও ডিসচার্জ হবে। কন্‌ডেন্‌সার যখন একদম ডিসচার্জ হয়ে গেছে কুণ্ডলীর ভেতর তখন কারেণ্ট সবচেয়ে বেশী। রেসিস্ট্যান্সের বেলায় কন্‌ডেন্‌সার ডিসচার্জ হলেই কারেণ্ট থেমে যায়, কিন্তু কুণ্ডলীর তারে একবার কারেণ্ট তৈরী হলে সহজে থামতে চায় না বলে তখনও কারেণ্ট চলতে থাকে, যদিও তার জোর ক্রমশ কমে যায়। তাহ'লে কন্‌ডেন্‌সার ডিস্‌চার্জ হয়ে যাবার পরও তার একপাত থেকে আর একপাতে বিদ্যুৎ যেতে থাকে অর্থাৎ কনডেনসার ডিসচার্জ হবার পর আবার উল্টো দিকে চার্জ হতে থাকে। আগে যে পাতটা পজিটিভ ছিল এবার সে পাতটা নেগেটিভ। যথাসময়ে কুণ্ডলীর কারেণ্ট যখন আবার থামবে তখন কিন্তু কন্‌ডেন্‌সার উল্টো দিকে পুরো চার্জ হয়ে গেছে। এবার কন্‌ডেন্‌সার আবার ডিসচার্জ হতে সুরু করবে ; কারেণ্ট হবে আগের বারের উল্টো দিকে। এ ভাবে ক্রমাগত দিক বদলে কারেণ্ট চলতে থাকে, অর্থাৎ কুণ্ডলীর ভেতর আপনা থেকে দিকফিরতি কারেণ্ট সৃষ্টি হয়।

দিকফিরতি কারেণ্ট মাত্রেরই কম্পন-সংখ্যা থাকে। এ ভাবে তৈরী দিকফিরতি বিদ্যুতের কম্পন-সংখ্যা কত হবে ?

কনডেনসার একবার পুরোপুরি চার্জ-করা অবস্থা থেকে পুরোপুরি ডিস্‌চার্জ হতে দিকফিরতি বিদ্যুতের এক সাইক্‌লের

চার ভাগের এক ভাগ সময় লাগবে। কন্‌ডেন্‌সারের ক্যাপাসিটি বেশী হলে ডিসচার্জ হতে বেশী সময় লাগবে। তেমনি কুণ্ডলীর ইন্‌ডাক্‌ট্যান্স বেশী হলেও কারেন্ট তাড়াতাড়ি কমতে বা বাড়তে পারে না বলে, ডিস্‌চার্জ হতে বেশী সময় লাগবে। একথা তাহলে খুব সহজেই বুঝতে পারছো যে ক্যাপাসিটি ও ইন্‌ডাক্‌ট্যান্স কম হলে কন্‌ডেন্‌সার খুব তাড়াতাড়ি চার্জ-ডিস্‌চার্জ হবে অর্থাৎ দিকফিরতি কারেন্টের কম্পন-সংখ্যা বেশী হবে। কম্পন-সংখ্যা সঠিক ভাবে হিসেব করতে হলে একথা জানলেই চলবে এই দিকফিরতি কারেন্টের কম্পন-সংখ্যা এমন যে কন্‌ডেন্‌সারের রিয়্যাক্‌ট্যান্স কুণ্ডলীর রিয়্যাক্‌ট্যান্সের সমান হবে অর্থাৎ

$$\frac{1}{6{\cdot}28 \times \text{কম্পন-সংখ্যা} \times \text{ক্যাপাসিটি}} = 6{\cdot}28 \times \text{কম্পন-সংখ্যা} \times \text{ইন্‌ডাক্‌ট্যান্স}$$

অথবা কম্পন-সংখ্যা

$$= \frac{1}{6{\cdot}28 \times \sqrt{\text{ক্যাপাসিটি} \times \text{ইন্‌ডাক্‌ট্যান্স}}}$$

সাইক্‌ল্‌ প্রতি সেকেণ্ডে

একটা উদাহরণ দিচ্ছি। মনে কর কন্‌ডেন্‌সারের ক্যাপাসিটি হচ্ছে 150 পিকোফ্যারাড

$$= \frac{150}{1{,}000{,}000} \text{ মাইক্রোফ্যারাড}$$

$$= \frac{150}{1{,}000{,}000 \times 1{,}000{,}000} \text{ ফ্যারাড।}$$

আর কুণ্ডলীর ইন্‌ডাক্‌ট্যান্স = 1·5 মিলিহেনরি

$$= \frac{15}{10000} \text{ হেনরি।}$$

তাহ'লে কম্পন-সংখ্যা হবে প্রতি সেকেণ্ডে

$$\frac{1}{6{\cdot}28 \times \sqrt{\dfrac{150}{1{,}000{,}000 \times 1{,}000{,}000} \times \dfrac{15}{10{,}000}}} \text{ সাইক্‌ল্}$$

স্বরুতেই বলেছি, বিদ্যুতের ঢেউয়ের উৎস হল উঁচুহারের দিকফিরতি বিদ্যুৎ। দিকফিরতি বিদ্যুতের কম্পন-সংখ্যাই হ'ল তার থেকে তৈরী বিদ্যুতের ঢেউয়ের কম্পন-সংখ্যা। বিদ্যুতের ঢেউয়ের কম্পন-সংখ্যা জানলে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কি করে হিসেব করতে হয় সে কথাও বইয়ের গোড়াতেই বলেছি; যেমন কম্পন-সংখ্যা সেকেণ্ডে 810 কিলোসাইক্‌ল্ হ'লে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হবে 370·4 মিটার।

3,000 মিটার থেকে 10,000 পর্যন্ত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের ঢেউকে বলে 'লং-ওয়েভ'। আমাদের দেশে লং-ওয়েভের কোন বেতার কেন্দ্র নেই। 3,000 মিটার থেকে 200 মিটার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের ঢেউকে বলে মিডিয়াম-ওয়েভ। আজকাল সাধারণত মিডিয়াম-ওয়েভে 200 থেকে 500 মিটার ও শর্ট-ওয়েভে 11 থেকে 90 মিটারে প্রোগ্রাম প্রচার করা হয়। মিডিয়াম-ওয়েভের-ঢেউ বড় জোর কয়েক শত মাইল দূরে যেতে পারে কিন্তু শর্ট-ওয়েভের ঢেউ কয়েক হাজার মাইল দূরে যেতে পারে।

এখানে বসে আমি বিলেতের বা আমেরিকার রেডিও প্রোগ্রাম শুনতে পারি, অর্থাৎ রেডিওর ঢেউ পৃথিবীর বাঁকা পিঠ ঘুরে আসতে পারে। আলোর ঢেউও বিদ্যুতের ঢেউ;

কিন্তু আলোর ঢেউয়ের বেলায় তা হয় না। আলোতো বরাবর সোজা পথেই চলে। বিদ্যুতের ঢেউ তাহ'লে পৃথিবীর এক পিঠ থেকে অন্য পিঠে আসে কি করে?

বিদ্যুতের ঢেউ দুটো কারণে বেঁকে আসতে পারে। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বেশী হলে ঢেউ কোন বাধা পেরিয়ে ঘুরে আসতে পারে। আলোর ঢেউয়ের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য খুব কম বলে আলো সোজা পথেই চলে, কিন্তু শব্দের ঢেউয়ের কথা ভাবো। শব্দের ঢেউয়ের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য প্রায় কয়েক ফুট পর্যন্ত হয়। তাই শব্দের ঢেউ বাঁকা পথে চলতে পারে। এঘরে বসে কথা বললে পাশের ঘরে সেকথা শোনা যায়। মিডিয়াম-ওয়েভের ঢেউ বড় বলে খানিক দূর পর্যন্ত পৃথিবীর পিঠ ঘুরে বেঁকে যেতে পারে। কিন্তু শর্ট-ওয়েভ এভাবে ততদূর যেতে পারে না।

শর্ট-ওয়েভ দূরে যায় অন্য কারণে। বেগুনির থেকে বেশী কম্পন-সংখ্যার আলোকে বলে 'আলট্রা-ভায়োলেট' আলো। সূর্যের থেকে আলট্রা-ভায়োলেট আলো পৃথিবীর অনেক ওপরে বাতাসের অক্সিজেনের অণু থেকে কিছু ইলেকট্রন ছিটকে বের করে দেয়। তার ফলে আমাদের মাথার উপরে একটা বিদ্যুতের স্তর সৃষ্টি হয়। এর ইংরাজী নাম 'আয়োনোস্ফিয়ার'। আলো যেমন আয়নার গায়ে লেগে প্রতিফলিত হয় তেমনি শর্ট-ওয়েভের রেডিও ঢেউ সোজা যেতে যেতে আয়োনোস্ফিয়ারে প্রতিফলিত হয়ে মাটীতে চলে আসে। মাটীতে এসে আবার প্রতিফলিত হয়ে আয়োনোস্ফিয়ারে ফিরে যায়। এভাবে ধাপে ধাপে রেডিও ঢেউ বহুদূর যেতে পারে।
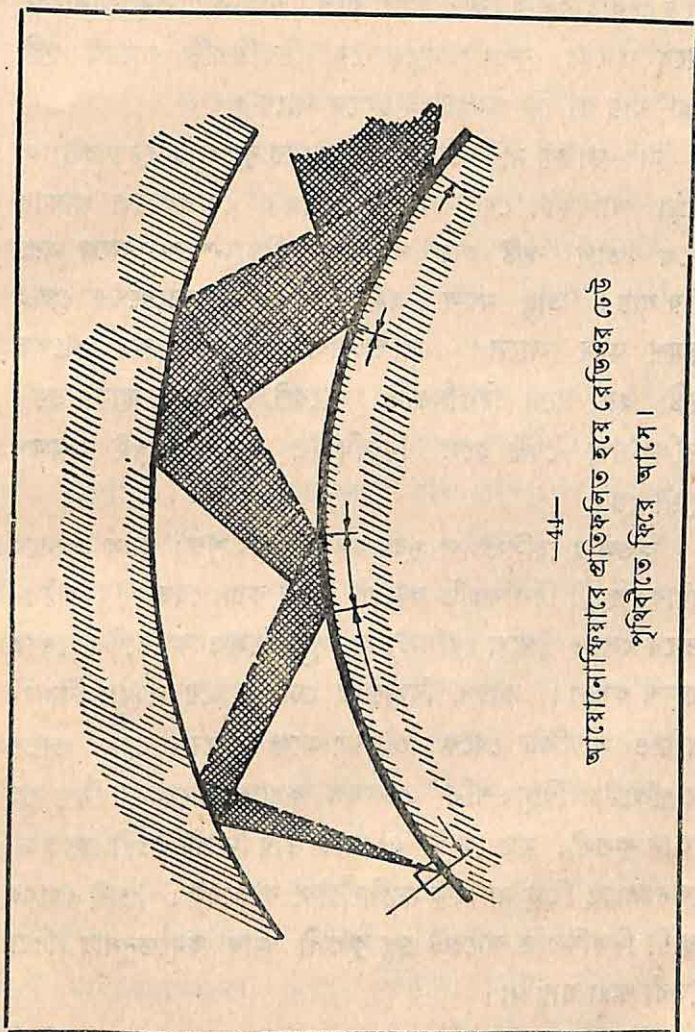
—44—
আয়োনোস্ফিয়ারে প্রতিফলিত হয়ে রেডিওর ঢেউ
পৃথিবীতে ফিরে আসে।

আবার চার্জ-করা কন্‌ডেন্‌সারের সাথে তারের কুণ্ডলী জুড়ে দেবার কথায় ফিরে আসা যাক। চার্জ-করা কন্‌ডেন্‌সারের সাথে তারের কুণ্ডলী জুড়ে যে দিকফিরতি কারেণ্ট সৃষ্টি করা যায় তা কি অনবরতই চলতে থাকে ?

না—তা হয় না। তার কারণ তারের কুণ্ডলীর ইন্‌ডাক্‌ট্যান্স ছাড়া খানিকটা রেসিস্ট্যান্সও থাকে। রেসিস্ট্যান্স থাকার ফলে তাপ সৃষ্টি হয়ে খানিকটা বিদ্যুৎ-শক্তি বাজে খরচ হয়ে যায়। তার ফলে এই দিকফিরতি কারেণ্টের জোর ক্রমশ কমে আসে। রেসিস্ট্যান্স কম হলে কম তাপের সৃষ্টি হয় বলে দিকফিরতি কারেণ্ট বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়। রেসিস্ট্যান্স বেশী হলে দিকফিরতি কারেণ্ট খুবই অল্পক্ষণ স্থায়ী হয়।

কুণ্ডলীর রেসিস্ট্যান্স খুব কম (অর্থাৎ শূন্য) হলে এভাবে বরাবর স্থায়ী দিকফিরতি কারেণ্ট তৈরী করা যেত। (সঠিক-ভাবে বলতে গেলে রেসিস্ট্যান্স শূন্য হলেও কারেণ্টের জোর ক্রমশ কমবে। কারণ, বিদ্যুতের ঢেউ ছড়িয়ে পড়লে বিদ্যুৎ-শক্তিও সারকিট থেকে ঢেউয়ের সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। তাতে সারকিটের বিদ্যুৎ-শক্তি ক্রমাগত কমতে থাকে)। কিন্তু যে কোন কুণ্ডলী, যত মোটা ও ছোট তার দিয়েই তৈরী হোক না কেন তাতে কিছু না কিছু রেসিস্ট্যান্স থাকবেই। তাই বরাবর স্থায়ী দিকফিরতি কারেণ্ট শুধু কুণ্ডলী আর কন্‌ডেন্‌সার দিয়ে তৈরী করা যায় না।

কিন্তু এমন কেউ যোগানদার যদি থাকে যে সারকিটে যতখানি শক্তিক্ষয় হবে সারকিটে ঠিক ততটুকু বিদ্যুৎ-শক্তি

যুগিয়ে যাবে, তবে আমরা বরাবর-স্থায়ী দিকফিরতি কারেণ্ট তৈরী করতে পারব।

তুমি যখন দোলনাতে দোল খাও তখনও ঠিক এ ধরনের ব্যাপার হয়। দোলনাতে একবার ধাক্কা দিয়ে তুলিয়ে দিলে কয়েক বার দোলার পর আস্তে আস্তে থেমে যায়। তার কারণ, দোলনা দোলার সময় বাতাসে ধাক্কা লেগে বাধা পায়। কিন্তু অনবরত অল্প ধাক্কা দিয়ে যেতে থাকলে দোলনা তুলতেই থাকবে, এখানে যোগানদার হ'ল যে দোলনায় ক্রমাগত ধাক্কা দিচ্ছে।

বিদ্যুতের বেলাতেও এ ধরনের যোগানদার সারকিট তৈরী করা যায় যা দিয়ে কুণ্ডলী আর কন্‌ডেন্‌সার সারকিটের দিক-ফিরতি বিদ্যুৎকে বরাবর-স্থায়ী করে রাখা চলে। রেডিওর চলতি কথায় এই সারকিটকে বলে 'অসিলেটর'। এর খুঁটিনাটি তোমাকে পরে বলবো। প্রত্যেক অসিলেটার সার-কিটে কন্‌ডেন্‌সার ও তার প্যারালালে একটা কুণ্ডলী থাকে। সারকিটের এই অংশটাকে বলে 'টিউনিং' সারকিট বা সুর-বাঁধা সারকিট। কুণ্ডলীর ইন্‌ডাক্‌ট্যান্স বদলে অথবা কন্‌ডেন্‌সারের ক্যাপাসিটি বাড়িয়ে-কমিয়ে বিদ্যুতের ঢেউয়ের কম্পন-সংখ্যা বা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ইচ্ছামত করে নেওয়া যায়।

45 নং ছবিটা দেখ। একটা অসিলেটর সারকিটে উঁচু-হারের কম্পনের দিকফিরতি কারেণ্ট তৈরী করা হচ্ছে। এই কারেণ্ট মাইক্রোফোনের সাথে সিরিজে বসান কুণ্ডলীর ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। , এই কুণ্ডলী আর তার ডানদিকের কুণ্ডলী মিলে হ'ল একটা ট্রান্সফরমার। বাঁদিকেরটা প্রাইমারী,

ডানদিকেরটা সেকেণ্ডারী। ইন্‌ডাক্‌সনের ফলে ডানদিকের কুণ্ডলীতেও দিকফিরতি কারেন্ট তৈরী হবে। ডানদিকের কুণ্ডলীর এক মাথা মাটিতে ও অন্য মাথা একটা উঁচু তারে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এই উঁচু তারটাকে বলে 'এরিয়েল'। এরিয়েল লাগালে বিদ্যুতের ঢেউ অনেক দূরে ছড়িয়ে পড়ে।

এই হ'ল আমাদের ট্র্যান্সমিটার বা বিদ্যুতের ঢেউয়ের মারফৎ খবর পাঠানোর যন্ত্র। কথা বা গান দূরে পাঠাতে হ'লে

—45—
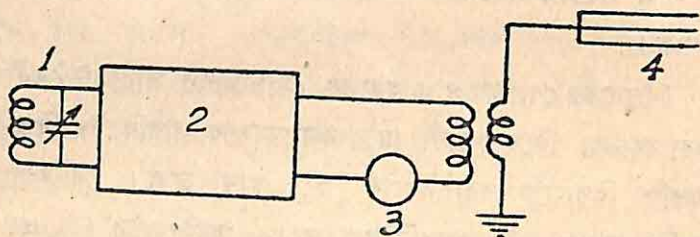
রেডিও ট্র্যান্সমিটার। 1—টিউনিং সারকিট। 2—যোগানদার বা অসিলেটর সারকিট। 3—মাইক্রোফোন। 4—এরিয়েল।

শব্দের ঢেউ বিদ্যুতের ঢেউয়ের পিঠে চাপিয়ে দেওয়া দরকার। এ ধরনের পিঠে চাপানোকে বলে 'মড্যুলেশন'। মড্যুলেশনের জন্য আমরা ট্র্যান্সমিটারে খুব সহজ ব্যবস্থা করতে পারি। অসিলেটরের সাথে সিরিজে একটা কার্বন মাইক্রোফোন জুড়ে দিয়েছি। তুমি ত জান কার্বন মাইক্রোফোনে কথা বললে তার রেসিস্ট্যান্স কমে-বাড়ে। এখানে তাহ'লে কি হবে বলতে পারো? মাইক্রোফোনে কথা বললে অসিলেটরের

দিকফিরতি বিদ্যুতের জোর বাড়বে কমবে। এমনি করে কথার ঢেউ বিদ্যুতের ঢেউয়ের পিঠে চাপিয়ে দেওয়া হ'ল। মড্যুলেশন

—46—
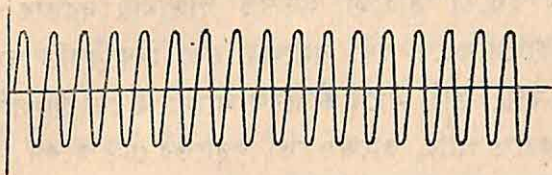
অসিলেটরে তৈরী উঁচুহারের কম্পনের (r. f.) দিকফিরতি কারেণ্ট।
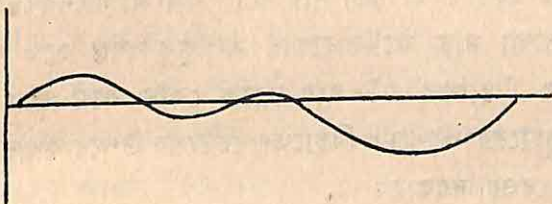
—47—

মাইক্রোফোনে কথা বলার দরুন তৈরী নিচুহারের কম্পনের (a. f.) কারেণ্ট।

—48—
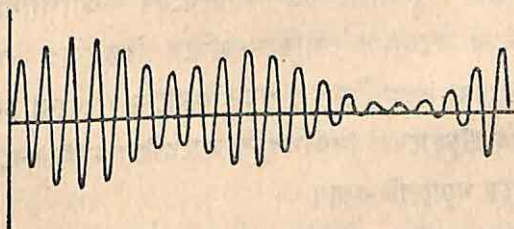
কথার ঢেউ দিয়ে মড্যুলেট-করা রেডিও ঢেউ।

47 নং ছবির ঢেউ 46 নং এর ঢেউয়ের উপরে চাপিয়ে দিলে 48 নং ছবির মত মড্যুলেট-করা ঢেউ হবে।

আরো নানারকম জটিল সারকিট দিয়ে মড্যুলেশন করা সম্ভব। সত্যিকারের রেডিও স্টেশনে সে-সব সারকিট দিয়েই মড্যুলেশন করা হয়। সে-সব সারকিটের কথা এখানে বলবো না।

তুমি হয়তো ভাবছো, অতশত হাঙ্গামায় দরকার কি? শুধু মাইক্রোফোনে কথা বললেই তো দিকফিরতি কারেণ্ট পাওয়া যায়, তার সাথে এরিয়েল লাগিয়েই তো ট্র্যান্সমিটার তৈরী করতে পারি, তাতেও তো বিত্যুতের ঢেউ হবে।

এভাবে ট্র্যান্সমিটার তৈরী করা যায় না। তার কারণ, দিকফিরতি কারেণ্টের কম্পন-সংখ্যা খুব বেশী না হ'লে জোরালো বিত্যুতের ঢেউ তৈরী করা যায় না। কথা বা গানের-ঢেউয়ের কম্পন-সংখ্যা মাত্র কয়েক হাজার সাইক্‌ল্ পর্যন্ত হতে পারে, তাতে যে বিত্যুতের ঢেউ হবে তাতে কোন কাজ হবে না। তাই উঁচুহারের কম্পনের বিত্যুতের ঢেউয়ের উপরে কথার ঢেউ চাপিয়ে দেওয়া দরকার।

তাহ'লে বেতার-প্রেরক যন্ত্র বা ট্রান্সমিটারের মূল কথা হল ঃ

• অসিলেটর দিয়ে উঁচুহারের দিকফিরতি কারেণ্ট তৈরী করা। (অসিলেটর সারকিটের ক্যাপাসিটি বা ইন্‌ড্যাক্‌ট্যান্স ইচ্ছেমত বাড়িয়ে-কমিয়ে বিত্যুতের ঢেউয়ের কম্পন-সংখ্যা বা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য খুশিমত কমানো-বাড়ানো চলে।)

• এই উঁচুহারের দিকফিরতি কারেণ্টকে মাইক্রোফোনের কারেণ্ট দিয়ে মড্যুলেট করা।

এর সঙ্গে দুটো নাম মনে রেখো। উঁচুহারের কম্পনকে বলা হয় রেডিও ফ্রিকোয়েন্‌সি, বা সংক্ষেপে আর. এফ. অর্থাৎ যে-কম্পনে বিত্যুতের ঢেউ হয় আর নিচুহারের শব্দের

কম্পনকে বলা হয় অডিয়ো ফ্রিকোয়েন্সি (অর্থাৎ যে-কম্পন কানে শোনা যায়) বা সংক্ষেপে এ. এফ.।

ট্র্যান্সমিটারের পরেই আসে বেতার-গ্রাহক যন্ত্র বা রেডিও 'রিসিভারের' কথা। রেডিও-রিসিভারের কাজ হচ্ছে রেডিও ঢেউ ধরে তার থেকে কথা ছেঁকে বের করে সে-কথা তোমাকে শোনানো। তা করতে গেলে রিসিভার যন্ত্রকে পর-পর এই কাজগুলো করতে হবে—

- প্রথমে শূন্যে ছড়ানো বিদ্যুতের ঢেউ থেকে মড্যুলেট-করা দিকফিরতি কারেন্ট ফিরে পাওয়া।
- তারপর সে কারেন্ট থেকে শুধু কথার ঢেউয়ের দরুন যে দিকফিরতি কারেন্ট তাকে ছেঁকে বার করা।
- সবশেষে, এই কারেন্টকে টেলিফোন বা লাউড-স্পীকারে পাঠিয়ে ট্র্যান্সমিটারে যে-কথা বলা হয়েছিল সে-কথার ঢেউ বাতাসে আবার তৈরী করা।

তবেই ট্র্যান্সমিটারে যে-কথা বলা হয়েছিল আমরা অবিকল সে-কথা শুনতে পাবো।

সব থেকে সহজ রিসিভার সারাকটের নক্সা পরের পাতায় আঁকা রয়েছে। এ ধরনের রিসিভারকে বলে 'ক্রস্ট্যাল রিসিভার'। ট্র্যান্সমিটার সারকিটের সাথে এর কিছুটা মিল রয়েছে দেখতে পাচ্ছো। এখানেও এরিয়েল রয়েছে। টিউনিং সারকিট রয়েছে।

ট্র্যান্সমিটারের এরিয়েলে যা হয়েছিল এখানে ঠিক তার উল্টো ব্যাপার হয়। সেখানে এরিয়েলে দিকফিরতি কারেন্ট ছিল। তা থেকে শূন্যে আপনিই বিদ্যুতের ঢেউ সৃষ্টি হয়েছিল।

রিসিভারের এরিয়েলে বিদ্যুতের ঢেউ এসে পড়লে আপনা থেকেই তাতে দিকফিরতি কারেণ্ট হয়। ট্র্যান্সমিটারের এরিয়েলে যে রকম মড্যুলেট-করা কারেণ্ট ছিল অবিকল সে

—49—
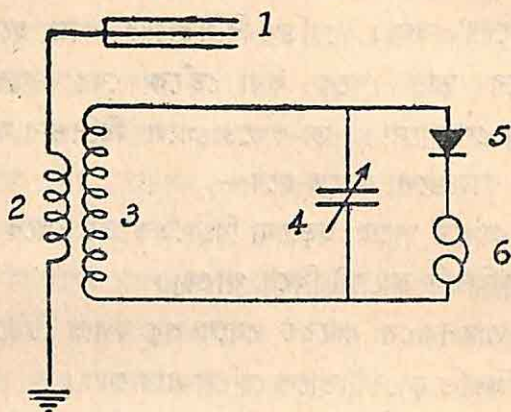
ক্রস্ট্যাল রিসিভার।

1—এরিয়েল। 2—এরিয়েলের কুণ্ডলী। 3—টিউনিং সারকিটের কুণ্ডলী। 4—টিউনিং সারকিটের ভেরিএব্‌ল্‌ কন্‌ডেন্‌সার। 5—ক্রস্ট্যাল। 6—টেলিফোন।

রকম। এরিয়েলের কুণ্ডলী থেকে টিউনিং সারকিটের কুণ্ডলীতে ইন্‌ডাক্‌শন হ'য়ে তাতে দিকফিরতি ভোল্টেজ স্থষ্টি হয়।

অসিলেটরের বেলায় দেখেছিলে প্রত্যেক টিউনিং সারকিটেরই একটা বিশেষ কম্পন-সংখ্যা থাকে। এখানেও তাই। কন্‌ডেন্‌সারের ক্যাপাসিটি বদলে আমরা ইচ্ছেমত কম্পন-সংখ্যায় সারকিটের স্থর বেঁধে নিতে পারি। টিউনিং কন্‌ডেন্‌সার লাগানো হাতল ঘুরিয়ে রিসিভারের টিউনিং সারকিটের কম্পন-সংখ্যা যদি ট্র্যান্সমিটারের কম্পন-সংখ্যার সমান করে নেয়া

হয় তবে টিউনিং সারকিটের ছু'মাথার অর্থাৎ কুণ্ডলীর ছু'মাথার মধ্যে দিকফিরতি ভোল্টেজের তফাৎ হবে খুব বেশী। একে বলে রিসিভারের স্থরবাঁধা বা টিউন করা। টিউন না করলে কুণ্ডলীর ছু'মাথায় ভোল্টেজ এত কম হবে যে তা দিয়ে কোন কাজ হয় না। টিউনিং-এর ফলে আর একটা মস্ত স্থবিধা হয়। প্রত্যেক ট্র্যান্সমিটারের কম্পন-সংখ্যা (বা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য) আলাদা আলাদা থাকে। তাই টিউনিং বদলে আমরা যখন যেটা খুশি শুনতে পারি। একটা ট্র্যান্সমিটারের প্রোগ্রাম টিউন করলে অন্য ট্র্যান্সমিটারের প্রোগ্রাম ধরা পড়ে না। এ ধরনের ব্যাপার না থাকলে কি হ'ত ভেবে দেখো। সব ট্র্যান্সমিটারের প্রোগ্রামই সমান জোরে ধরা পড়লে কারুর প্রোগ্রামই স্পষ্ট বোঝা যেত না। সব মিলিয়ে একটা হট্টগোল হ'ত। **টিউনিং সারকিটের স্টেশন বাছাই করার ক্ষমতা সব চেয়ে ভাল হয় যদি টিউনিং সারকিটের কুণ্ডলীর রেসিস্ট্যান্স কম থাকে।** রেসিষ্ট্যান্স বেশী হলে একটা ট্র্যান্সমিটার টিউন করলে তার কাছাকাছি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের ট্র্যান্সমিটারের প্রোগ্রাম কম-বেশী শোনা যায়।

বিছ্যতের ঢেউ থেকে এভাবে আমরা মড্যুলেট-করা বিছ্যৎ ফিরে পেলাম।

তুমি হয়তো আমায় জিজ্ঞেস করতে পার—এবার বুঝি টিউনিং সারকিটের প্যারালালে টেলিফোন লাগিয়ে দিলেই কথা শোনা যাবে?

তার উত্তরে আমি বলবো—একটু মাথা ঘামিয়ে ভেবে দেখা যাক, শোনা যাবে কি যাবে না। ধরে নাও, একটা

টেলিফোন কুণ্ডলীর দু'মাথায় জুড়ে দেওয়া হ'ল। টেলিফোনের ভেতর দিয়ে যে কারেণ্ট যাবে তার গ্রাফ হ'ল 48 নং ছবির মত। এই কারেণ্টের কম্পন-সংখ্যা খুব বেশী। অন্ততপক্ষে সেকেণ্ডে কয়েক শ' কিলোসাইক্‌ল্ বা কয়েক মেগাসাইক্‌ল্।

টেলিফোনের পর্দা এত তাড়াতাড়ি কাঁপতে পারে না। কাঁপতে পারলেও যে শব্দ হবে তা আমরা কানে শুনতে পাব না। কারণ সেকেণ্ডে 20 কিলোসাইক্‌লের বেশী কম্পন আমরা কানে শুনতে পাই না।

যদি তাও শুনতে পেতাম তাহ'লে যে শব্দ শুনতাম তা মোটেই ট্র্যান্সমিটারের মাইক্রোফোনের সামনে বলা কথা নয়। কারণ কথার ঢেউ আর মড্যুলেট-করা ঢেউয়ের চেহারা আলাদা।

একথা তাহ'লে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে শুধু টেলিফোন লাগালেই আমরা কথা শুনতে পাবো না। টেলিফোনে কথা শুনতে হ'লে মড্যুলেট-করা কারেণ্ট থেকে শুধু কথার জন্য যে কারেণ্ট তা ছেঁকে বার করতে হবে।

মড্যুলেট-করা ঢেউ থেকে এ ভাবে কথা ছেঁকে বার করাকে রেডিওর চলতি ভাষায় বলে 'ডিটেক্‌শন'। যে যন্ত্র দিয়ে ডিটেক্‌শন করা হয় তাকে বলে 'ডিটেক্‌টর'।

ডিটেক্‌শন করা কি করে সম্ভব?

দিকফিরতি কারেণ্ট টেলিফোনের ভেতর দিয়ে কিছুক্ষণ একদিকে আর কিছুক্ষণ তার উল্টো দিকে যায়। এমন যদি কোনও ব্যবস্থা করা যায় যে টেলিফোনের ভিতর দিয়ে কারেণ্ট এক দিকেই চলে কিন্তু উল্টো দিকে চলে না তবে আপনা থেকেই ডিটেক্‌শন হবে। তার কারণ, খুব উঁচু

হারের কাঁপুনির কারেণ্টের বেলায় টেলিফোনের পর্দা কাঁপবে গড়পড়তা কারেণ্ট অনুসারে। কারেণ্ট এদিক-ওদিক চললে গড়পড়তা কারেণ্ট হচ্ছে শূন্য। তখন টেলিফোনের পর্দা কাঁপে না। কিন্তু যদি শুধু একদিকেই কারেণ্ট চলে তবে গড়পড়তা কারেণ্ট শূন্য নয়। তাই টেলিফোনের পর্দা সাড়া দেয়।

কথাটা আরো খানিকটা খুলেই বলি। দোলনার কথা আবার ভাবো। ধর, তুমি আর আমি দোলনার হু' দিকে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। তুমি আর আমি পালা করে দোলনায় ধাক্কা দিচ্ছি। তুমি ধাক্কা দেবার খানিক পরেই আমি ধাক্কা দিলাম। তারপর আবার তুমি ধাক্কা দিলে। এভাবে যদি আমরা পর-পর ধাক্কা দিয়ে যাই তবে দোলনা এদিক-ওদিক হুলবে। কিন্তু আমরা যদি খুব অল্প সময় পর-পর সমান জোর ধাক্কা দিতে থাকি, ধর সেকেণ্ডে কয়েক লক্ষ বার, তখন কি দোলনা হুলবে? কক্ষনো না? অত ঘন ঘন হু'দিকে সমান ধাক্কা পড়লে দোলনা স্থির হয়ে থাকবে। কারণ এক দিকে চলতে স্থুরু করার সাথেই উল্টোদিকে ধাক্কা পড়ছে। কিন্তু একজন যদি সরে দাঁড়াই, তখন শুধু এক দিকেই ধাক্কা পড়ছে বলে দোলনা হুলবে। হাতের ধাক্কা যদি মড্যুলেট-করা কারেণ্টের মত কখনও কম কখনও বেশী হয় তবে দোলনাও ঠিক সেই অনুপাতে হুলবে। টেলিফোনের ভিতর দিয়েও ঠিক এক দিকে মড্যুলেট-করা কারেণ্ট গেলেই ঠিক এমনি ধারা ব্যাপার হয়।

তাহলে বোঝা গেল-ডিটেকশন করতে হ'লে দিকফিরতি কারেণ্টকে একমুখী করতে হবে।

গ্যালেনা, সিলিকন, কার্বরাণ্ডাম, জারমেনিয়াম, এদের স্ফটিক বা ক্রুস্ট্যালের একটা বিশেষ গুণ হচ্ছে এদের ভিতর দিয়ে কারেন্ট একদিকেই যেতে পারে অন্যদিকে যেতে পারে
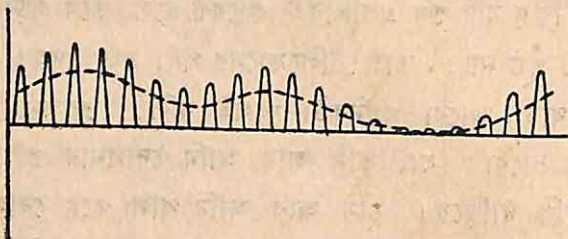
—50—

48 নং ছবির মড্যুলেট-করা রেডিও-ঢেউ ডিটেকশনের পর এ ধরনের চেহারা নেবে। বিচ্ছিন্ন রেখা দিয়ে আঁকা গ্রাফটি হ'ল টেলিফোনের ভেতর দিয়ে যাওয়া কারেন্টের গ্রাফ।

না। অর্থাৎ কারেন্ট ঠিক বদলালে ক্রুস্ট্যালের রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যায়। ঠিক যেন কোলকাতার চিড়িয়াখানার গেট। একটা গেট দিয়ে লোক শুধু ঢুকতেই পারে, বেরোতে পারে না। অথবা অন্য গেট দিয়ে বেরোতেই পারে, ঢুকতে পারে না।

আর ফলাও করে না বললেও একথা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে টেলিফোনের সাথে যদি সিরিজ-এ একটা ক্রুস্ট্যাল লাগিয়ে দাও তাহ'লে আর ডিটেকশনের জন্য ভাবতে হবে না। ক্রুস্ট্যাল রেডিওর নকশার ছবিটা আবার দেখ। সেখানে ঠিক এই ব্যবস্থাই রয়েছে। এবার টেলিফোনে কান পাতলেই তুমি কথা শুনতে পাবে। এই হ'ল আমাদের পুরো রিসিভার যন্ত্র।

টেলিফোনের প্যারালালে একটা কম ক্যাপাসিটির কন্‌ডেন্‌সার লাগালে ডিটেক্‌শন আরো ভাল হয়। মড্যুলেট-করা কারেন্টের প্রত্যেক অর্ধেক সাইক্‌ল্ টেলিফোনের ভেতর দিয়ে যাবার সময় কন্‌ডেন্‌সারকে চার্জ করে। বাকি অর্ধেক সাইক্‌লে (যখন কারেন্টের দিক বদলে যায়) এমনিতে টেলিফোনের ভেতর দিয়ে কোন কারেন্ট যাবার কথা নয়। কিন্তু কন্‌ডেন্‌সারে চার্জ ছিল। তাই যেই ক্রস্ট্যালের ভেতর-দিয়ে-আসা কারেন্ট থেমে যাবে তখনই কন্‌ডেন্‌সার ডিস্‌চার্জ হতে থাকবে। কন্‌ডেন্‌সারে জমান বিদ্যুৎ টেলিফোনের ভেতর দিয়ে যেতে থাকবে। অর্থাৎ বাকি অর্ধেক সাইক্‌লেও টেলিফোনের ভেতর দিয়ে কারেন্ট যাবে। কন্‌ডেন্‌সারে জমান এই বাড়তি বিদ্যুতের থেকে তাহ'লে খানিকটা ফালতু কারেন্ট পাওয়া যাবে। এতে টেলিফোনের ভেতর-দিয়ে-যাওয়া মোট কারেন্ট বেড়ে যাবে, শব্দের জোরও বেড়ে যাবে। কন্‌ডেন্‌সার লাগানোর ফলে টেলিফোনের ভেতর-দিয়ে-যাওয়া মোট কারেন্ট হবে 50 নং ছবির বিচ্ছিন্ন রেখা দিয়ে আঁকা গ্রাফের মত।

কন্‌ডেন্‌সারের ক্যাপাসিটি বেশী হ'লে কিন্তু মুস্কিল। দিকফিরতি কারেন্টর বেলায় কন্‌ডেন্‌সারের ক্যাপাসিটি বেশী হ'লে বাধা বা রিয়্যাক্‌ট্যান্স খুব কম হয়। তাই ক্যাপাসিটি বেশী হ'লে বেশীর ভাগ কারেন্টই সহজ পথ পেয়ে কন্‌ডেন্‌সারের ভেতর দিয়ে যাবে, টেলিফোনের ভেতর দিয়ে খুব কম কারেন্টই যাবে। তাতে টেলিফোনে শব্দের জোর কমে যায়।

ক্রিস্ট্যাল রেডিওর অসুবিধা হচ্ছে তা দিয়ে ট্র্যান্সমিটার থেকে মাত্র কয়েক মাইলের মধ্যেই শোনা যায়। ট্র্যান্সমিটার থেকে অনেকদূরে রেডিও ঢেউয়ের জোর কমে আসে। তখন ক্রিস্ট্যাল রেডিওর টেলিফোনে কারেণ্ট এত কম হয় যে শব্দ শোনাই যায় না।

অ্যাম্‌প্লিফায়ার কাকে বলে মনে আছে? যা দিয়ে কারেণ্ট বা ভোল্টেজকে বাড়িয়ে নেয়া যায়। বাড়িয়ে নেয়াকে ইংরাজীতে বলে 'অ্যাম্‌প্লিফাই' করা। অ্যাম্‌প্লিফাই করে বলে এ যন্ত্রের নাম হল অ্যাম্‌প্লিফায়ার।

যদি অ্যাম্‌প্লিফায়ার দিয়ে রেডিওর দিকফিরতি কারেণ্ট বা ভোল্টেজের জোর বাড়িয়ে নেয়া যায় তবে অনেক দূরে বসেও প্রোগ্রাম শোনা যাবে। অ্যাম্‌প্লিফায়ার-এর আরো একটা সুবিধা রয়েছে। কারেণ্ট বাড়িয়ে নিলে তা দিয়ে টেলিফোনের বদলে লাউড-স্পীকার চালানো যায়। এতে অনেকেই এক সাথে প্রোগ্রাম শুনতে পারে।

১১
রেডিও টিউব

আলাদীনের গল্প নিশ্চয়ই পড়েছো। আলাদীনের একটা প্রদীপ ছিল যা দিয়ে সে একটা প্রকাণ্ড দৈত্যকে বশে রেখেছিলো। আলাদীনের প্রদীপ আর তার দৈত্য অবশ্য নিছক গালগল্প। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এমন একটা প্রদীপ আবিষ্কার করেছেন যাকে আলাদীনের প্রদীপের সঙ্গেই তুলনা করা চলে কারণ তা দিয়ে আলাদীনের দৈত্যের থেকেও অনেক বেশী ক্ষমতাশালী বিদ্যুৎকে তাঁরা পুরোপুরি বশ করতে পেরেছেন। এই প্রদীপকে বিলেতে বলে 'রেডিও ভাল্‌ভ্‌', আমেরিকায় 'রেডিও টিউব' বা 'ইলেকট্রন টিউব'। আমরা একে বরাবরই বলবো 'টিউব'। কারণ আজকাল এই নামটাই চল্‌তি।

রেডিও টিউবের সবরকম ব্যবহারের কথা বললে তা রূপ-কথাকেও ছাড়িয়ে যাবে। রেডিও, টেলিভিশন, অ্যাম্‌প্লিফায়ার, রেডার ইত্যাদি নানারকম যন্ত্রপাতি তৈরী করতে হলেই চাই রেডিও টিউব। এমন কি রেডিও টিউব দিয়ে আজকাল এমন সব যন্ত্র তৈরী হচ্ছে যা নিমেষের মধ্যে বড় বড় আঁক কষতে পারে, যেগুলি কষতে গেলে খুব মাথাওলা লোকেরও মাসের পর মাস বছরের পর বছর লেগে যেতো।

আমাদের রেডিওর বাকী গল্পটা হলো রেডিও টিউব নিয়ে। এ বইতে অবশ্য রেডিও টিউবের ক্ষমতার খুব অল্প পরিচয়ই

দিতে পারবো, কারণ রেডিও টিউবের সব কথা বলতে গেলে, কমপক্ষে এরকম একশোখানা বইতেও কুলোবে না। রেডিও টিউবের বাকী সব কথা বড়ো হয়ে তুমি নিশ্চয়ই শিখবে।

রেডিওতে এর সাধারণত তিন রকম ব্যবহার। অ্যাম্প্লি-ফায়ার, ডিটেক্টর অথবা অসিলেটর হিসেবে। প্রথমে যে টিউবের কথা বলবো তার নাম 'ডায়োড'। ডায়োডকে শুধু ডিটেক্টর হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

জল গরম করলে যেমন তা থেকে বাষ্প বেরিয়ে আসে তেমনি যে কোনো ধাতুকে গরম করলেই তার থেকে ইলেকট্রনরা ছিটকে বেরিয়ে আসে। এই বেরিয়ে-আসা ইলেকট্রনদের কাজে লাগানোর উপরেই রেডিও টিউবের পুরো ব্যাপারটা নির্ভর করে। ডায়োডে একটা কাঁচের বাল্‌বের ভেতরে থাকে একটা সরু তার (ফিলামেণ্ট) ও তা থেকে খানিকটা দূরে একটা ধাতুর পাত বা প্লেট (51 নং ছবি দেখ)। বালবের ভেতরে বাতাস থাকে না। টিউব তৈরী করার সময়ে পাম্প দিয়ে সব বাতাস বের করে নেওয়া হয়। ছবিতে দেখ টিউবের তলায় ফিলামেণ্ট ও প্লেট থেকে তার বেরিয়ে এসেছে। এবার ফিলামেণ্টে দু'মাথার তারে বাইরে থেকে ব্যাটারী জুড়ে দিলে ফিলামেণ্টের ভেতর দিয়ে কারেণ্ট যাবে, ফিলামেণ্টের তার গরম হবে। তার ফলে ফিলামেণ্টের ভেতর থেকে অনেক ইলেকট্রন বেরিয়ে এসে বালবের ভেতরে ফিলামেণ্টের চারপাশে জড়ো হবে। মনে রেখো ফিলামেণ্ট গরম করার ব্যাটারীকে বলে A-ব্যাটারী। এবার মনে কর আর একটা ব্যাটারীর (একে বলে B-ব্যাটারী) নেগেটিভ (–) মাথা ফিলামেণ্টের যে কোনো একটা তারে ও

পজিটিভ (+) মাথা প্লেটে জুড়ে দেওয়া হলো। তুমি জানো যে যেদিকে ভোল্টেজ পজিটিভ, ইলেকট্রনদের যাওয়ার ঝোঁক সেদিকেই। তাই যে ভাবে বলেছি সে ভাবে ব্যাটারী জুড়লে ফিলামেণ্ট থেকে বেরিয়ে-আসা অনেক ইলেকট্রন ছুটে প্লেটে হাজিরহবে ও B-ব্যাটারীর ভেতর দিয়ে ঘুরে এসে আবার ফিলামেণ্টে আসবে। সেখানে এসে আবার ফিলামেণ্ট থেকে বেরিয়ে আগের পথেই চলতে থাকে। এর ফলে বাইরের তারে প্লেট থেকে B-ব্যাটারীর ভেতর দিয়ে ফিলামেণ্ট পর্যন্ত ইলেকট্রনরা ক্রমাগত চলতে থাকে। ইলেকট্রন চলার বাকী পথটুকু হলো ডায়োডের ভেতরে, ফিলামেণ্ট থেকে প্লেট পর্যন্ত। এই পুরো পথটাকে বলবো প্লেট-সার্কিট। প্লেট-সার্কিটের তারে একটা মিলিঅ্যামিটার বসিয়ে এই কারেণ্ট মাপা যায়। মনে আছে নিশ্চয়ই ইলেকট্রন চলার উল্টো দিকটাকেই বিহ্যতের চলতি ভাষায় কারেণ্ট চলার দিক বলা হয়। অর্থাৎ বিহ্যতের চলতি ভাষায় বলতে হবে প্লেটের ভোল্টেজ ফিলামেণ্টের ভোল্টেজের থেকে বেশী হলে টিউবের ভেতরে প্লেট থেকে ফিলামেণ্টের দিকে কারেণ্ট চলে। তাহ'লে প্লেট-সার্কিটে
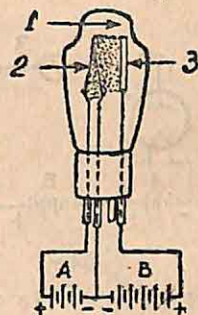
—51—
ডায়োড টিউব
1—কাচের বায়ুশূন্য বালব। 2—ফিলামেণ্ট। 3—প্লেট। A—ফিলামেণ্ট গরম করবার কম ভোল্টেজের ব্যাটারী। B—প্লেটে লাগানো বেশী ভোল্টেজের ব্যাটারী। 2 এবং 3'র মধ্যে কালো বিন্দুগুলি ইলেকট্রন।

যে মিলিঅ্যামিটার বসবে তার নেগেটিভ-টার্মিনালকে প্লেটে জুড়তে হবে, আর পজিটিভ-টার্মিনালকে B-ব্যাটারীর পজিটিভে জুড়তে হবে। আর একটা কথা মনে রেখো, B-ব্যাটারীর ভোল্টেজ বেশী হলে প্লেটে ছুটে-আসা ইলেকট্রনদের সংখ্যা বাড়ে তাই প্লেটে সার্কিটের কারেণ্ট বেশী হয়।
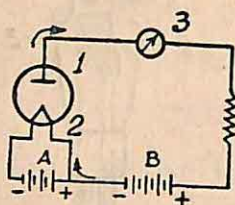
—52—

ডায়োড সারকিটের নকশা

1—প্লেট। 2—ফিলামেণ্ট। 3—প্লেট কারেণ্ট মাপবার মিলিঅ্যামিটার।

B-ব্যাটারীকে উল্টো ভাবে জুড়লে অর্থাৎ — দিকটা ডায়োডের প্লেটে ও + দিকটা ডায়োডের ফিলামেণ্টে জুড়লে প্লেট-সারকিটে কোনো কারেণ্ট হবে না। কারণটা বোঝা খুব সহজ। প্লেট নেগেটিভ ও
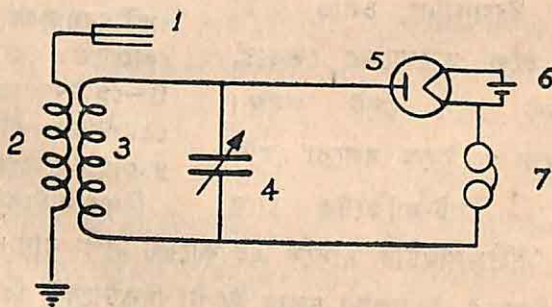
—53—

ডায়োড ডিটেক্টর

1—এরিয়েল। 2—এরিয়েল কুণ্ডলী। 3—টিউনিং সারকিটের কুণ্ডলী। 4—টিউনিং কন্‌ডেন্‌সার। 5—ডায়োড। 6—ফিলামেণ্ট-ব্যাটারী (A—ব্যাটারী)। 7—হেডফোন।

ফিলামেণ্ট পজিটিভ হলে ইলেকট্রনরা প্লেটের দিকে না গিয়ে ফিলামেণ্টের দিকেই থাকবে। অর্থাৎ ডায়োডের ভেতর দিয়ে উল্টোদিকে কারেণ্ট পাঠানো যায় না।

বালবের ভেতরে বাতাস থাকলে বাতাসের কণাগুলি ইলেকট্রনদের চলার পথে ব্যাঘাত ঘটায় বলে বালবের ভেতরটা বায়ুশূন্য করে নেওয়া হয়।

এবার তাহ'লে একথা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে ডায়োডের ভেতর দিয়ে (প্লেট-সার্কিটে) এক দিকেই কারেণ্ট চলে বলে ক্রস্ট্যালের বদলে ডিটেক্টর হিসেবে ডায়োড ব্যবহার করা যেতে পারে। ক্রস্ট্যালের বদলে ডায়োড বসালে 78 পৃষ্ঠার রিসিভার সারকিটের নক্‌শা 53 নং ছবির মতন হবে। রেডিও সারকিটে ব্যবহার করবার সময় প্লেট-সারকিটে B-ব্যাটারী ব্যবহার করার দরকার হয় না। শুধু ফিলামেণ্ট গরম করার A-ব্যাটারী ব্যবহার করা হয়।

—51—
(1) ফিলামেণ্ট দিয়ে
(2) ক্যাথোডটিকে গরম করা হয়।

—55—
শুধু ফিলামেণ্টযুক্ত ডায়োডের চিহ্ন

—56—
ফিলামেণ্ট ও আলাদা ক্যাথোড-যুক্ত ডায়োডের চিহ্ন

টেলিফোনের সঙ্গে ডায়োডকে সিরিজ-এ জুড়ে দিতে হয়।

মড্যুলেট-করা কারেণ্ট ডায়োডের ভেতর দিয়ে যাবার সময় আপনা থেকেই ডিটেকশন হয়।

অনেক সময় প্লেট-সারকিট থেকে ফিলামেণ্ট-সারকিট একদম আলাদা রাখার দরকার হয়। অর্থাৎ প্লেট-সারকিট আর ফিলামেণ্ট-সারকিটের মধ্যে যেন কোনো বৈদ্যুতিক যোগাযোগ থাকে না। সে জন্য রেডিও টিউবের ভেতরকার গঠনে ও খানিকটা রকমফের করতে হয়। ফিলামেণ্টকে একটা ধাতুর পাত দিয়ে মুড়ে রাখা হয়। তাকে বলা হয় 'ক্যাথোড'। ক্যাথোড আর ফিলামেণ্টের মধ্যে ইনস্যুলেটর থাকে। তার ফলে ফিলামেণ্টের সঙ্গে ক্যাথোডের কোনো বৈদ্যুতিক যোগাযোগ থাকে না। ফিলামেণ্ট গরম হ'লে ক্যাথোডও গরম হয়। ক্যাথোড থেকে বেরিয়ে-আসা ইলেকট্রনরা প্লেট-সারকিটে কারেণ্ট তৈরী করে। B-ব্যাটারীর নেগেটিভ প্রান্ত ফিলামেণ্টের বদলে ক্যাথোডে জুড়ে দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থায় প্লেট-সারকিট আর ফিলামেণ্ট-সারকিটের মধ্যে কোনো বৈদ্যুতিক যোগ থাকে না।
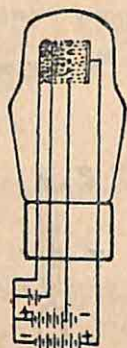
—57—

ট্রায়োড
ফিলামেণ্ট ও প্লেটের মধ্যের তারটি গ্রিড।

ডায়োডের পরেই আসে ট্রায়োডের কথা। ডায়োডের প্লেট আর ফিলামেণ্টের (অথবা ক্যাথোডের) মাঝখানে ফিলামেণ্ট (বা ক্যাথোডের) খুব কাছে একটা তারের জাল বসিয়ে

দিলেই ট্রায়োড টিউব তৈরী হলো। তারের জালটাকে বলে গ্রিড। ট্রায়োড দিয়ে অ্যাম্‌প্লিফায়ার-ডিটেক্‌টর বা অসিলেটর সারকিট তৈরী করা যায়।

প্রথমে বলবো অ্যামপ্লিফায়ার-সারকিটের কথা। মনে কর ট্রায়োডের প্লেট ও ফিলামেণ্টের মধ্যে B-ব্যাটারী জুড়ে দেওয়া হলো। B-ব্যাটারীর + প্রান্ত প্লেটে ও − প্রান্ত ফিলামেণ্টে। ডায়োডের মতনই A-ব্যাটারী দিয়ে ফিলামেণ্টকে গরম করা হচ্ছে। তাহ'লে, গ্রিডের কথা বাদ দিলে প্লেট আর ফিলামেণ্ট মিলে একটা ডায়োড তৈরী হলো বলে ভাবা যায়। B-ব্যাটারী যে ভাবে লাগানো রয়েছে (অর্থাৎ + দিকটা প্লেটে) তাতে প্লেট-সারকিটে বরাবরই কারেণ্ট চলবে। এবার মনে কর ফিলামেণ্ট আর গ্রিডের মধ্যে একটা ব্যাটারী জুড়ে দেওয়া হলো। একে বলে C-ব্যাটারী। C-ব্যাটারীর ভোল্টেজ B-ব্যাটারী থেকে অনেক কম।
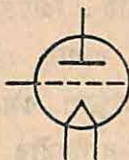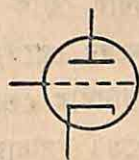
—58— ফিলামেণ্টযুক্ত ট্রায়োডের চিহ্ন

—69— ক্যাথোডযুক্ত ট্রায়োডের চিহ্ন

মনে কর C-ব্যাটারীর ভোল্টেজ তুমি ইচ্ছেমত কমাতে বাড়াতে পার। B-ব্যাটারীতে ভোল্টেজ ঠিক রেখে C-ব্যাটারীর ভোল্টেজকে অল্প বদলালেই প্লেট-কারেণ্ট খুব বেশী বদলে যায়। গ্রিড আগের থেকে একটু পজিটিভ হ'লে অর্থাৎ গ্রিডের ভোল্টেজ বাড়ালে প্লেট-কারেণ্ট বেড়ে যায়।

গ্রিডের ভোল্টেজ **অল্প** কমালে অর্থাৎ গ্রিড আগের থেকে নেগেটিভ হলে প্লেট-কারেণ্ট কমে যায়। তার কারণ ফিলামেণ্ট থেকে বেরিয়ে-আসা ইলেকট্রনরা গ্রিডের জালের ফাঁক দিয়ে প্লেটের দিকে যাচ্ছে; গ্রিডের ভোল্টেজ বাড়লে ফিলামেণ্ট থেকে বেরিয়ে-আসা ইলেকট্রনদের প্লেটের দিকে যাবার ঝোঁক বেড়ে যায়; গ্রিডের ভোল্টেজ কমলে ইলেকট্রনদের প্লেটের দিকে যাবার ঝোঁক কমে যায়। তাই ব্যাটারীর ভোল্টেজ বাড়লে কমলে প্লেট-কারেণ্ট ও বাড়ে কমে। সাধারণত C-ব্যাটারীর নেগেটিভ দিকটা গ্রিডে ও পজিটিভ দিকটা ফিলামেণ্টে লাগানো থাকে। নেগেটিভ গ্রিডের পাহারার ভেতর দিয়ে খুব কম ইলেকট্রনই প্লেটে পৌঁছতে পারে। গ্রিড ফিলামেণ্টের খুবই কাছে থাকে বলে গ্রিডের ভোল্টেজ **অল্প** বাড়লে কমলে প্লেট-সার্কিটের কারেণ্ট **অনেকখানি** বাড়ে কমে। অন্য যে কোন ভাবে গ্রিডের ভোল্টেজ বাড়ালে কমালেও একই ফল হবে।

অ্যাম্প্লিফায়ার হিসেবে ট্রায়োডকে ব্যবহার করতে হলে C-ব্যাটারী দিয়ে গ্রিডে বরাবরই খানিকটা নেগেটিভ ভোল্টেজ দিয়ে রাখা হয়। এই ভোল্টেজটাকে বলে 'গ্রিড-বায়াস্' (গ্রিড নেগেটিভ থাকলে গ্রিডে কোনো ইলেকট্রনই আসতে চায় না। তাই গ্রিড সারকিটে কোনো কারেণ্ট হয় না বলে গ্রিড-ব্যাটারী কখনো খরচ হয় না)।

গ্রিড-বায়াস্ দিয়ে রাখা দরকার কেন পরে বলবো। এবার প্লেট-সারকিটে একটা টেলিফোন জুড়ে দিলেই সবথেকে সহজ অ্যাম্প্লিফায়ার সারকিট তৈরী হলো (60 নং ছবি দেখ)।

গ্রিড আর ফিলামেণ্টের মধ্যে (ছবিতে যে ভাবে দেখানো রয়েছে) একটা কার্বন মাইক্রোফোন জুড়ে দেওয়া হলো। C-ব্যাটারীটা এখানে মাইক্রোফোনের ব্যাটারী হিসেবেও কাজ করছে। এবার মাইক্রোফোনে কথা বললেই টেলিফোনে সে কথা অনেক জোরে শোনা যাবে। তার
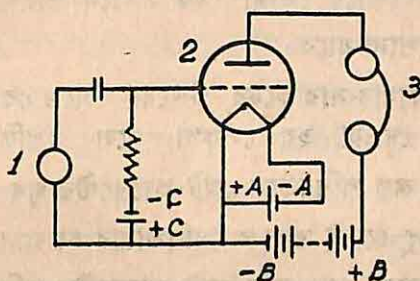
—60—

ট্রায়োড-অ্যাম্প্লিফায়ার

1—মাইক্রোফোন। 2—ট্রায়োড টিউব। 3—হেডফোন। A—ফিলামেণ্ট-ব্যাটারী। B—প্লেট-ব্যাটারী। C—গ্রিড-বায়াস্ ব্যাটারী।

কারণ, মাইক্রোফোনে কথা বললে গ্রিড-সারকিটে গ্রিড আর ফিলামেণ্টের মধ্যে যে রেসিস্ট্যান্স রয়েছে তার ভেতর-দিয়ে-যাওয়া কারেণ্ট বাড়বে কমবে। একথা নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি যে কোন রেসিস্ট্যান্সের ভেতর দিয়ে-যাওয়া কারেণ্ট বাড়লে কমলে তার ছু'মাথার ভোল্টেজের তফাৎ ও সেই অনুপাতে বাড়ে কমে। তাহলে মাইক্রোফোনে কথা বললে গ্রিড আর ফিলামেণ্টের মধ্যে ভোল্টেজের তফাৎ সেই অনুপাতে কমবে বাড়বে। একটু আগেই বলেছি গ্রিডের ভোল্টেজের খুব অল্প

পরিবর্তন হ'লেই প্লেট-সারকিটের কারেন্টের খুব বেশী পরিবর্তন হয়। তাই মাইক্রোফোনে কথা বললে টেলিফোনের ভেতর-দিয়ে-যাওয়া কারেন্ট শব্দের কম্পন অনুসারে খুব বেশী বাড়বে কমবে। তখন টেলিফোনে-শোনা শব্দের জোর খুব বেশী বেড়ে যায়। মাইক্রোফোনের সাথে শুধু টেলিফোনে লাগালে যত জোরে শোনা যেত এখানে তার চেয়ে অনেক বেশী জোরে শোনা যাবে।

অ্যাম্প্লিফায়ার-সারকিটের টিউবের গ্রিডে কেন নেগেটিভ গ্রিড-বায়াস দেওয়া হয় সেকথা খুলে বলছি। **গ্রিড-ভোল্টেজের অল্প পরিবর্তনে প্লেট-কারেন্টের খুব বেশী পরিবর্তন হবে** শুধু এতেই ভাল অ্যাম্প্লিফায়ার হয় না। অ্যাম্প্লিফিকেশন ঠিকমত হতে হলে **প্লেট-কারেন্টের পরিবর্তন গ্রিড-ভোল্টেজের পরিবর্তনের অনুপাতে হওয়া দরকার।** অর্থাৎ গ্রিড-ভোল্টেজের খানিকটা পরিবর্তনে প্লেট কারেন্টের যতটুকু পরিবর্তন হবে গ্রিড-ভোল্টেজের দ্বিগুণ পরিবর্তনে প্লেট-কারেন্টের পরিবর্তনও আগের থেকে দ্বিগুণ, গ্রিড-ভোল্টেজের পরিবর্তন তিনগুণ হলে প্লেট-কারেন্টের পরিবর্তনও তিনগুণ হওয়া দরকার। এ রকম সমান অনুপাতে পরিবর্তন না হলে গ্রিড-ভোল্টেজের গ্রাফের চেহারা প্লেট-কারেন্টের গ্রাফের চেহারা থেকে আলাদা ধরনের হবে। শব্দের কথায় বলেছিলাম, শব্দের কম্পনের ছবির চেহারা আলাদা হ'লে ধ্বনি বদলে যায়। তাই প্লেট-ভোল্টেজের পরিবর্তন গ্রিড-ভোল্টেজের পরিবর্তনের মত না হলে ধ্বনি-বিকৃতি হয়। অর্থাৎ মাইক্রোফোনে-বলা কথা টেলিফোনে ঠিক অবিকল সেভাবে

শোনা যাবে না। মাইক্রোফোনে তুমি মিষ্টি সুরে কথা বললেও অ্যাম্প্লিফাই করার পর টেলিফোনে সে কথা বিচ্ছিরি শোনাবে। অ্যাম্প্লিফায়ারের গ্রিডে একটা বিশেষ পরিমাণ নেগেটিভ বায়াস্ দিয়ে রাখলে প্লেট-কারেণ্টের পরিবর্তন ঠিক গ্রিড ভোল্টেজের পরিবর্তনের অনুপাতে হয়। তখন মাইক্রোফোনে বলা কথা অ্যাম্প্লিফাই করার পর প্রায় অবিকল শোনা যায়। সঠিক গ্রিড-বায়াস্ কত দেওয়া দরকার সেকথা পরে বলবো।

ট্রায়োডের প্লেট-সারকিটে টেলিফোনের বদলে একটা রেসিস্ট্যান্স বসিয়ে দিলে যে সারকিট হবে তাকে বলে ভোল্টেজ-অ্যাম্প্লিফায়ার। একটা ভোল্টেজ-অ্যাম্প্লিফায়ার সারকিটের নকশা নিচে আঁকা রয়েছে। এর গ্রিডে একটা রিবন মাইক্রোফোন লাগান রয়েছে, গ্রিড-বায়াস্ ব্যাটারীর সিরিজে। প্লেট-সারকিটের রেসিস্ট্যান্সকে বলে প্লেটলোড। মাইক্রোফোনে কথা বললে প্লেটলোডের হু'মাথার ভোল্টেজের তফাৎও অবিকল গ্রিড-ভোল্টেজের মতো কমবে বাড়বে। কিন্তু এই কমা-বাড়ার মাত্রাটা গ্রিড ভোল্টেজের কমা-বাড়ার মাত্রা থেকে অনেকগুণ বেশী হবে।
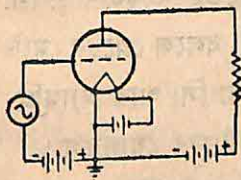
—61—

ভোল্টেজ-অ্যামপ্লি-ফায়ার

গ্রিডে দিকফিরতি ভোল্টেজ চাপালে প্লেট-লোডের হু'মাথার মধ্যে তার অনেকগুণ বেশী দিকফিরতি ভোল্টেজ পাওয়া যাবে।

একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ধর, গ্রিড-ভোল্টেজ 1 ভোল্ট বাড়লে প্লেট কারেণ্ট বাড়ে 1 মিলিঅ্যাম্পেয়ার অর্থাৎ $\frac{1}{1000}$ অ্যাম্পেয়ার। প্লেটলোড

যদি 50,000 ওম হয় তবে 1 মিলিঅ্যাম্পেয়ার কারেন্ট বাড়ার জন্য তার ছ'মাথায় ভোল্টেজের তফাৎ বাড়বে $\frac{1}{1000}$ অ্যাম্পেয়ার × 50,000 ওম = 50 ভোল্ট। 1 ভোল্টকে অ্যাম্প্লিফাই করে 50 ভোল্ট করা হ'ল। অর্থাৎ গ্রিডের ভোল্টেজ 50 গুণ অ্যাম্প্লিফাই করা সম্ভব হল।

গ্রিড-ভোল্টেজের পরিবর্তনে প্লেটলোডের ছ'মাথায় ভোল্টেজের তফাতের পরিবর্তন হচ্ছে না বলে একথাও বলা চলে যে গ্রিড-ভোল্টেজের পরিবর্তনে প্লেট-ভোল্টেজের পরিবর্তন হচ্ছে। কারণ প্লেটলোডের যে মাথাটা ব্যাটারীতে লাগানো সেখানকার ভোল্টেজ বরাবরই ব্যাটারীর ভোল্টেজের সমান থাকবে। সেজন্য প্লেটলোডের ছ'মাথার মধ্যে ভোল্টেজের তফাতের যা পরিবর্তন হবে তার পুরোটাই হচ্ছে প্লেটলোডের অন্য মাথায় অর্থাৎ টিউবের প্লেটে। প্লেটে এমনিতেই একটা ডি. সি. ভোল্টেজ থাকে। তাই মাইক্রোফোনে কথা বললে প্লেটের মোট ভোল্টেজকে আমরা ভাবতে পারি একটা ডি. সি. আর অ্যাম্প্লি-ফাই করা এ. সি. অথবা দিকফিরতি ভোল্টেজের যোগফল।

পর পর ছটো তিনটে বা তারও বেশী টিউব বসিয়ে আমরা যে কোন দিকফিরতি ভোল্টেজকে ধাপে ধাপে অনেক-খানি অ্যাম্প্লিফাই করতে পারি। তার জন্যে একটা টিউবের প্লেট থেকে তার পরের টিউবের গ্রিডে দিকফিরতি ভোল্টেজকে পৌঁছে দিতে হবে। এভাবে অনেকগুলি টিউব বসিয়ে গেলে প্রথম টিউবের গ্রিডে যে দিকফিরতি ভোল্টেজ পড়বে সবশেষ টিউবের প্লেটে তা অনেকগুণ অ্যাম্প্লিফাই-করা অবস্থায় পাওয়া যাবে।

একটা টিউবের প্লেটের ভোল্টেজ তার পরের টিউবের

গ্রিডে পৌঁছে দিতে হলে প্রথম টিউবের প্লেটের সাথে তার পরের টিউবের গ্রিড সোজাসুজি জুড়ে দেওয়া চলবে না। কারণ প্রথম টিউবের প্লেটে দুটো ভোল্টেজ রয়েছে। একটা হ'ল পজিটিভ ডি. সি. ভোল্টেজ আর একটা হ'ল দিক-ফিরতি ভোল্টেজ। আমরা দিকফিরতি ভোল্টেজটাকেই পরের টিউবের গ্রিডে পৌঁছে দিতে চাই। ডি. সি. ভোল্টেজকে নয়। কারণ প্রথম টিউবের প্লেটের পজিটিভ ডি. সি. ভোল্টেজ দ্বিতীয় টিউবের গ্রিডে পড়লে তার গ্রিডের বায়াস্ পজিটিভ হয়ে যাবে। তাতে অ্যাম্প্লিফিকেশন ঠিকমতন হবে না। টিউবের গ্রিডে বেশী মাত্রায় পজিটিভ ভোল্টেজ পড়লে টিউবও খারাপ হয়ে যেতে পারে। **তাই ডি. সি.-কে আটকে দিয়ে শুধু দিকফিরতি ভোল্টেজকেই পরের টিউবে পাঠানো দরকার।** কন্ডেন্সার বা ট্রান্স-ফর্মার দিয়ে এ ধরনের কাজ করা সম্ভব। কারণ কন্ডেন্সারের ভেতর দিয়ে বা ট্রান্সফর্মারের মারফৎ ডি. সি. পাঠানো যায় না কিন্তু এ. সি. পাঠানো চলে। এক টিউব থেকে এভাবে অন্য টিউবে ভোল্টেজ পাঠানোকে বলে কাপলিং। তিন রকম কাপলিং সারকিটের নকশা এখানে পর পর দেওয়া হলো।

রেসিস্ট্যান্স-ক্যাপাসিটি কাপলিং

প্রথম সারকিটে, প্রথম টিউবের প্লেটলোড হলো একটা রেসিস্ট্যান্স। প্রথম টিউবের প্লেট আর দ্বিতীয় টিউবের গ্রিডের মধ্যে একটা কন্ডেন্সার জুড়ে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় টিউবের গ্রিড আর ফিলামেন্টের মধ্যে একটা রেসিস্ট্যান্স

লাগানো রয়েছে। প্রথম টিউবের প্লেটে যে অ্যাম্‌প্লিফাই-করা ভোল্টেজ হবে তাতে কাপলিং-কন্‌ডেন্‌সার আর দ্বিতীয় টিউবের গ্রিড-রেসিস্ট্যান্সের ভেতর দিয়ে দিকফিরতি কারেণ্ট যাবে।
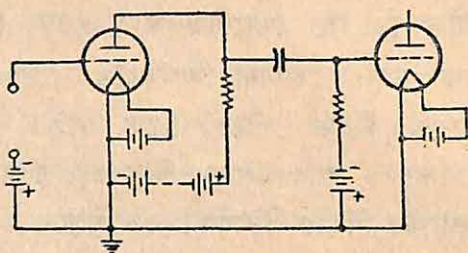
—62—

রেসিস্ট্যান্স-ক্যাপাসিটি কাপলিং

এই কারেণ্টে গ্রিড রেসিস্ট্যান্সের দু'মাথায় যে দিকফিরতি ভোল্টেজ হবে দ্বিতীয় টিউব সেই ভোল্টেজকে আবার অ্যাম্‌প্লিফাই করবে।

চোক-কাপলিং

দ্বিতীয় সারকিটে প্রথম টিউবের প্লেটলোড হিসেবে রেসিস্ট্যান্সের বদলে একটা ইন্‌ডাক্‌ট্যান্স বা চোক দেওয়া রয়েছে। আর সব-কিছুই আগের সারকিটের মতন। একথা তুমি জানো যে, চোক-এর ইন্‌ডাক্‌ট্যান্স বেশী হলে দিকফিরতি কারেণ্টের বেলায় তার রিয়াক্‌ট্যান্স বা বাধা খুব বেশী হয়। কিন্তু ডি. সি.'র বেলায় তার বাধা প্রায় কিছুই নয়। তাই চোক দিলে টিউবের প্লেটে ডি. সি. ভোল্টেজ প্রায় B-ব্যাটারীর ভোল্টেজের সমানই থাকে। রেসিস্ট্যান্স প্লেটলোড হলে তা হয় না। সব ট্রায়োডেই প্লেটের ডি. সি. ভোল্টেজ বেশী হ'লে

অ্যাম্‌প্লিফিকেশন বেশী হয়। কিন্তু অ্যাম্‌প্লিফিকেশন খানিকটা কম হলেও রেসিস্ট্যান্স-প্লেটলোড এক হিসেবে চোকের থেকে
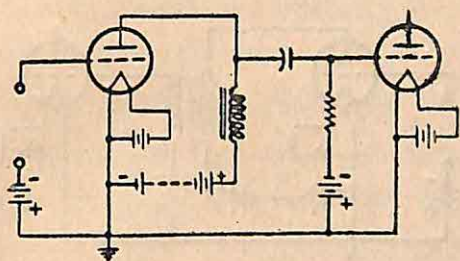
—53—

চোক-কন্‌ডেন্‌সার কাপলিং

ভালো। চোকের রিয়্যাকট্যান্স কম্পন-সংখ্যা বেশী হ'লে বাড়ে, কম্পন-সংখ্যা কম হ'লে কমে। তার জন্যে চোক প্লেটলোড হলে সব কম্পন-সংখ্যায় ভোল্টেজ-অ্যাম্‌প্লিফিকেশন সমান হয় না। তার জন্য খানিকটা ধ্বনি-বিকৃতি হয়।

ট্রান্সফর্মার-কাপলিং

তৃতীয় সারকিটে একটা ট্রান্সফর্মার দিয়ে কাপলিং হচ্ছে। ট্রান্সফর্মারের প্রাইমারী হচ্ছে প্রথম টিউবের প্লেটলোড। সেকেণ্ডারীর এক মাথা গ্রিডে অন্য মাথা ফিলামেণ্ট লাগানো রয়েছে। এ ধরনের কাপলিং-এ দ্বিতীয় টিউবে গ্রিড-রেসি-স্ট্যান্সের দরকার নেই। এখানেও খানিকটা ধ্বনি-বিকৃতি হয়। ট্রান্সফর্মারের সেকেণ্ডারী কুণ্ডলীর পাকের সংখ্যা প্রাইমারী কুণ্ডলীর পাকের থেকে বেশী হলে সেকেণ্ডারীতে ভোল্টেজ বেশী হয়। তাই সেকেণ্ডারীর পাকের সংখ্যা প্রাইমারীর থেকে বেশী হলে মোট ভোল্টেজ-অ্যাম্‌প্লিফিকেশন

বাড়ে। কিন্তু সেকেণ্ডারীর পাকের সংখ্যা খুব বাড়ানোর উপায় নেই। তাহলে ধ্বনি-বিকৃতি খুব বেশী বেড়ে যায়।
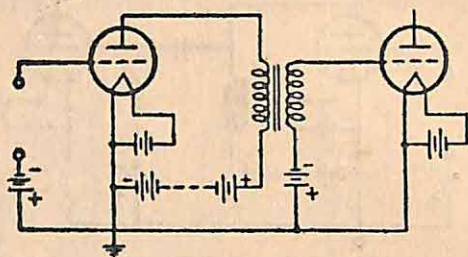
—64—

ট্রান্সফর্মার-কাপলিং

এই তিন ধরনের কাপলিং এ. এফ. ভোল্টেজ অর্থাৎ মাইক্রোফোনে বলা কথার দরুন যে ভোল্টেজ বা রেডিওতে ডিটেক্‌শনের পর যে ভোল্টেজ হয় তা অ্যাম্‌প্লিফাই করবার সার্কিটে ব্যবহার করা হয় (এ. এফ. আর. আর. এফ. কাকে বলে নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি)। এ. এফ ভোল্টেজ-অ্যাম্‌প্লিফায়ারের চোক আর ট্রান্সফর্মার লোহার আর্মেচারের উপর জড়ানো হয়।

আর. এফ. ভোল্টেজ অ্যাম্‌প্লিফায়ারে কাপলিং-এর ব্যাপারটা একটু আলাদা ধরনের। রেসিস্ট্যান্স-কন্‌ডেন্‌সার কাপলিং-এ মিডিয়াম ওয়েভে মোটটি ভালোই অ্যাম্‌প্লিফিকেশন হয় কিন্তু শর্টওয়েভে ভালো অ্যাম্‌প্লিফিকেশন হয় না। এক্ষেত্রে সাধারণত ট্রান্সফর্মার-কাপলিং ব্যবহার করা হয়। কিন্তু তাতে লোহার আর্মেচারে ট্রান্সফর্মার জড়ানো চলে না। প্রাইমারী সেকেণ্ডারী পাশাপাশি জড়ানো

হয় ইন্‌স্যুলেটরের নলের উপরে। প্রাইমারী, সেকেণ্ডারী অথবা তুয়েরই প্যারালালে কন্‌ডেন্‌সার জুড়ে যে কম্পন-সংখ্যার আর. এফ. ভোল্টেজকে অ্যাম্‌প্লিফাই করা হবে সেই কম্পন-সংখ্যায় ট্রান্সফর্মারকে টিউন করা চলে। এ ভাবে টিউন করলে শুধু যে অ্যাম্‌প্লিফিকেশন বেশী হয় তা নয়, সার্কিটের প্রোগ্রাম বাছাই করার ক্ষমতা ও বাড়ে। অর্থাৎ যে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে ট্র্যান্সফর্মার টিউন করা সেই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রেডিও স্টেশনের প্রোগ্রামেই সব থেকে বেশী অ্যাম্‌প্লিফিকেশন হবে। খুব কাছাকাছি অন্য তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের স্টেশন রেডিওতে ধরা পড়বে না। টিউন-করা ট্রান্সফর্মার তিন রকমের হয়—

(১) টিউন-না-করা-প্রাইমারী, টিউন-করা-সেকেণ্ডারী। এই ধরনের ট্র্যান্সফর্মারে অ্যাম্‌প্লিফিকেশন বেশী হয়, কিন্তু বাছাই করার ক্ষমতা খুব বেশী নয়।

(২) টিউন-করা-প্রাইমারী, টিউন-না-করা-সেকেণ্ডারী। এতে অ্যাম্‌প্লিফিকেশনও বেশী হয় না বাছাই করার ক্ষমতাও কম। তাই এ ধরনের ট্রান্সফর্মার ব্যবহার হয় না।

(৩) প্রাইমারী ও সেকেণ্ডারী তুই-ই একই কম্পন-সংখ্যায় টিউন-করা। এতে প্রথম ধরনের ট্রান্সফর্মার থেকে অ্যাম্‌প্লি-ফিকেশন কম হলেও বাছাই করার ক্ষমতা খুব বেশী।

এধরনের ট্র্যান্সফর্মার কি ভাবে জুড়তে হবে তার নকশা আগেই পেয়েছ। আবার বলছি, প্রাইমারী থাকবে প্রথম টিউবের প্লেটলোড আর সেকেণ্ডারীর একটা মাথা যাবে দ্বিতীয় টিউবের গ্রিডে ও অন্য মাথা যাবে দ্বিতীয় টিউবের ফিলামেণ্টে।

এ পর্যন্ত যে সব ট্র্যায়োডের ছবি নকশায় দেখলে তার প্রত্যেকটাতেই ফিলামেন্টটাই ক্যাথোড। কিন্তু ডায়োডের বেলায় যে রকম আলাদা ক্যাথোডের কথা বলেছিলাম, ট্রায়োডেও তেমনি আলাদা ক্যাথোড দিয়ে টিউব তৈরী হয়। এখন থেকে বেশীর ভাগ ছবিতেই ফিলামেণ্ট বা তার সাথে লাগানো ফিলামেণ্ট গরম করার A-ব্যাটারী আঁকবো না। ফিলামেণ্ট আর A-ব্যাটারী মনে মনে ছবিতে জুড়ে দিও।

অ্যাম্প্লিফায়ার টিউবে C-ব্যাটারী ছাড়াও গ্রিড-বায়াস্
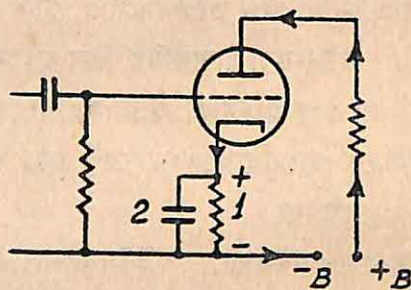
—65—

ক্যাথোড-বায়াস্

1—রেসিস্ট্যান্সের ভেতর দিয়ে প্লেট কারেণ্ট যাবার ফলে ক্যাথোড গ্রিডের থেকে পজিটিভ হয়ে (C ব্যাটারীর সাহায্য না নিয়েই) উপযুক্ত গ্রিড-বায়াস্-ভোল্টেজ তৈরী হবে। 2—হ'ল বাইপাস্-কন্ডেন্সার।

দেওয়া যায় (65 নং ছবি দেখ)। ক্যাথোডকে সরাসরি B-ব্যাটারীর নেগেটিভে না লাগিয়ে সিরিজে একটা রেসিস্ট্যান্স বসিয়ে লাগানো হয়েছে। প্লেট-সার্কিটের কারেণ্ট চলার পথ তীর চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে। প্লেট-কারেণ্ট ক্যাথোডে

লাগানো রেসিস্ট্যান্সের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে বলে ক্যাথোড —B থেকে পজিটিভ অর্থাৎ ক্যাথোডের ভোল্টেজ B-ব্যাটারীর
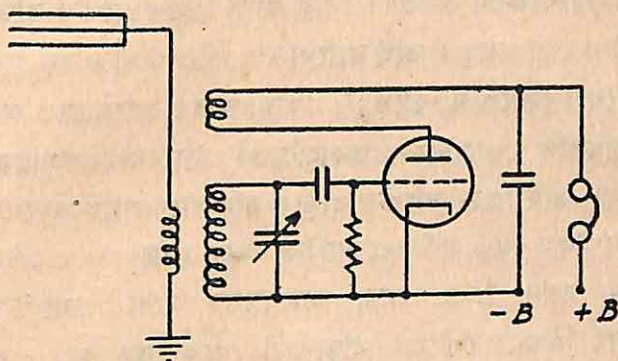
—66—
গ্রিড-লিক ডিটেক্টর রিসিভার

নেগেটিভ থেকে বেশী। এই ভোল্টেজ = প্লেট-কারেণ্ট × ক্যাথোড-রেসিস্ট্যান্স। B-ব্যাটারীর নেগেটিভের সাথে গ্রিড লাগানো রয়েছে। তাহ'লে ক্যাথোড হলো গ্রিডের থেকে পজিটিভ অর্থাৎ গ্রিড ক্যাথোডের থেকে নেগেটিভ। এভাবে তাহ'লে গ্রিডে বায়াস্ দেওয়া সম্ভব হলো। ধরো তিন ভোল্ট বায়াস্ দেওয়া দরকার। প্লেট-কারেণ্ট যদি 15 মিলি অ্যাম্পেয়ার হয় তাহ'লে ক্যাথোড রেসিস্ট্যান্স হবে 200 ওম। কারণ

15 মিলি অ্যাম্পেয়ার × 200 ওম = $\frac{15}{1000}$ অ্যাম্পেয়ার × 200 ওম = $\frac{15}{1000}$ × 200 ভোল্ট = 3 ভোল্ট।

লক্ষ্য করে দেখ, ক্যাথোড-রেসিস্ট্যান্সের প্যারালালে একটা কন্‌ডেন্‌সার লাগানো রয়েছে। এভাবে লাগানো

কন্‌ডেন্‌সারকে বলে বাইপাস্‌-কন্‌ডেন্‌সার। ক্যাথোড-রেসিস্ট্যান্সের প্যারালালে এভাবে কন্‌ডেন্‌সার না লাগালে অ্যাম্‌প্লিফিকেশন কম হয়। তার কারণ গ্রিড-ভোল্টেজ বাড়লে প্লেট-কারেন্ট বাড়ে। তাই ক্যাথোডও বেশী পজিটিভ হয় অর্থাৎ ক্যাথোড-ভোল্টেজ বাড়ে। গ্রিড আর ক্যাথোডের মধ্যে দিকফিরতি ভোল্টেজের তফাৎটাকেই ট্রায়োড অ্যাম্‌প্লিফাই করে। তাই গ্রিড-ভোল্টেজ বাড়লে যদি সাথে সাথে ক্যাথোড-ভোল্টেজও বাড়ে বা গ্রিড-ভোল্টেজ কমলে ক্যাথোড-ভোল্টেজও কমে তখন গ্রিড আর ক্যাথোডের মধ্যে ভোল্টেজের তফাৎ গ্রিড-ভোল্টেজের বাড়া-কমা থেকে কম হয়। তাই গ্রিডে যে দিকফিরতি ভোল্টেজ এসে পড়ে তার কিছুটা অ্যাম্‌প্লিফাই হয় না। সেজন্য প্লেট-কারেন্টের দিকফিরতি অংশটাকে ক্যাথোড-রেসিস্ট্যান্সের ভেতর দিয়ে যেতে দিতে নেই। বেশী ক্যাপাসিটির বাইপাস্‌ কন্‌ডেন্‌সার দিলে সহজ পথ পেয়ে (মনে আছে নিশ্চয়ই যে ক্যাপাসিটি বেশী হলে দিকফিরতি বিদ্যুতের পথে কন্‌ডেন্‌সারের বাধা খুবই কম) প্লেট-কারেন্টের দিকফিরতি অংশটা রেসিস্ট্যান্সের ভেতর দিয়ে যায় না। অর্থাৎ সোজা কথায় ভাবতে পারো দিকফিরতি বিদ্যুতের বেলায় ক্যাথোড-রেসিস্ট্যান্সের দু'মাথাকে যেন শর্ট সারকিট করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্লেট-সারকিটের ডি. সি. কারেন্টের বেলায় তা নয়। ডি. সি কারেন্টকে ক্যাথোড-রেসিস্ট্যান্সের ভিতর দিয়ে যেতে হচ্ছে। তাই বাইপাস্‌-কন্‌ডেন্‌সার থাকলে অ্যাম্‌প্লিফিকেশন কমে না।

ট্রায়োড দিয়ে কি করে ডিটেক্টর সার্কিট তৈরী করা যায় এবার সে কথা বলছি। 66 নং নকশাটা হলো একধরনের ট্রায়োড ডিটেক্টর সার্কিটের। একে বলে গ্রিড-লিক ডিটেক্টর। এ ধরনের ডিটেক্টরে গ্রিড-বায়াস্ দেবার দরকার হয় না। এখানে গ্রিড আর ক্যাথোড মিলে একটা ডায়োড হলো বলে ভাবতে পারো। কোন বায়াস্-ভোল্টেজ দেওয়া থাকে না বলে আর. এফ. ভোল্টেজের

আর. এফ. ট্রান্সফর্মার-কাপলিং
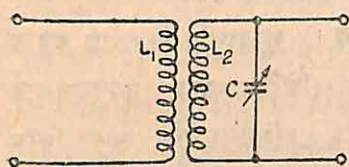
—67—
টিউন-না-করা-প্রাইমারী
টিউন-করা-সেকেণ্ডারী
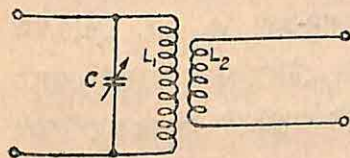
—68—
টিউন-করা-প্রাইমারী
টিউন-না-করা-সেকেণ্ডারী
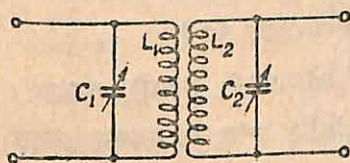
—69—
একই কম্পন-সংখ্যায় টিউন-করা-প্রাইমারী ও সেকেণ্ডারী

অর্ধেক সাইক্লে গ্রিড ক্যাথোডের থেকে নেগেটিভ, বাকি অর্ধেক সাইক্লে পজিটিভ। গ্রিড যখন ক্যাথোডের থেকে পজিটিভ, তখন প্লেটের দিকে যারা যাচ্ছে সে সব

ইলেকট্রনদের কিছু কিছু গ্রিডের গায়ে চলে আসে। তখন গ্রিড সার্কিটের ভেতর দিয়ে অর্থাৎ গ্রিড-রেসিস্ট্যান্সের ভেতর দিয়ে কারেণ্ট চলে। বাকী অর্ধেক সাইক্‌লে অর্থাৎ গ্রিড যখন ক্যাথোড থেকে নেগেটিভ, তখন কোনো ইলেকট্রনই গ্রিডে আসে না; তাই গ্রিড সার্কিটে কারেণ্ট চলে না। গ্রিডের সাথে কন্‌ডেন্‌সার লাগানো রয়েছে বলে অবশ্য একটু অন্য রকম ব্যাপার হয়। গ্রিডে পৌঁছনো ইলেকট্রনরা প্রথমে কন্‌ডেন্‌সারের পাতে জমা হয়। তারপর আস্তে আস্তে বরাবরই রেসিস্ট্যান্সের ভেতর দিয়ে কারেণ্ট চলে অর্থাৎ কন্‌ডেন্‌সার ডিসচার্জ হতে থাকে। পুরোপুরি ডিসচার্জ হবার আগেই গ্রিড ক্যাথোড থেকে পজিটিভ হলে কন্‌ডেন্‌সার আবার চার্জ হবে। এভাবে গ্রিড রেসিস্ট্যান্সের ভেতর দিয়ে বরাবর ডিটেক্‌শন-করা কারেণ্ট চলে। তাই গ্রিড রেসিস্ট্যান্সের দু'মাথায় ডিটেক্‌শন-করা এ. এফ. ভোল্টেজ সৃষ্টি হয়। এবার প্লেট-সারকিটের টেলিফোনে অনেক জোরে শব্দ শোনা যাবে, কারণ প্লেট-সারকিটে গ্রিড-ভোল্টেজের অনেকখানি অ্যাম্‌প্লিফিকেশন হয়। এ ধরনের ডিটেক্‌টরে একই সঙ্গে ডিটেক্‌শন ও অ্যাম্‌প্লিফিকেশন হয়।

লক্ষ্য করে দেখ, প্লেট-সার্কিটে একটা কুণ্ডলী রয়েছে। এধরনের কুণ্ডলী থাকলে অ্যাম্‌প্লিফিকেশন অনেকগুণ বেড়ে যায়। 82 পৃষ্ঠায় ডিটেক্‌শন-করা আর. এফ.-এর ছবিটা আবার দেখ। তাতে দেখতে পাবে ডিটেক্‌শন করার পর যে ভোল্টেজ হলো তা পুরোপুরি এ. এফ. নয়। এ. এফ.-এর সঙ্গে আর. এফ.-ও মেশানো রয়েছে। প্লেটে কুণ্ডলী থাকলে তাকে

একটা ট্রান্সফর্মারের প্রাইমারী ভাবতে পারো। সেকেণ্ডারী হলো গ্রিডের টিউনিং কয়েল। প্লেট-সার্কিটের অ্যাম্‌প্লিফাই করা কারেণ্টের আর. এফ. অংশটা ইন্‌ডাক্‌শনের মারফৎ গ্রিড কয়েলে আর. এফ. ভোল্টেজের জোর অনেকখানি বাড়িয়ে দেয় যদি প্লেট-সার্কিটের কুণ্ডলীটা বিশেষ ভাবে জড়ানো থাকে। প্লেট থেকে +B পর্যন্ত জড়ানোর দিকটা ক্যাথোড থেকে গ্রিড পর্যন্ত টিউনিং কয়েলটা যেদিকে জড়ানো রয়েছে সেদিকে হওয়া চাই। উল্টোভাবে জড়ালে গ্রিড সার্কিটের আর. এফ. ভোল্টেজ বাড়ে না বরং কমে যায়। কারণ তখন ইন্‌ডাক্‌শন থেকে যে ভোল্টেজ হয় তা এরিয়েল থেকে পাওয়া গ্রিড ভোল্টেজের উল্টো দিকে হয়। এধরনের বাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থাকে বলে 'ফিড্‌-ব্যাক'। কুণ্ডলী দুটোকে কাছাকাছি নিয়ে গেলে ফিড্‌-ব্যাক বেড়ে যায়।

ফিড্‌-ব্যাকের কাজ হলো যেন টিউনিং সার্কিটের রেসিস্ট্যান্স কমিয়ে দেওয়া। ফিড্‌-ব্যাক ক্রমাগত বাড়াতে থাকলে টিউনিং সার্কিটের রেসিস্ট্যান্স কমবে, আর. এফ. ভোল্টেজ বাড়বে, সার্কিটের স্টেশন বাছাই করার ক্ষমতাও খুব বেড়ে যাবে। ফিড্‌-ব্যাক সার্কিট দিয়ে তৈরী এক টিউবের রেডিওতেই অনেক দূরের প্রোগ্রামেও খুব জোরে শোনা যায়। ফিড্‌-ব্যাক খুব বাড়িয়ে দিলে গ্রিড-সার্কিটের রেসিস্ট্যান্স একেবারে শূন্য হয়ে যাবে। অর্থাৎ টিউনিং সার্কিটে রেসিস্ট্যান্স থাকার ফলে তাপ সৃষ্টি হয়ে যে পরিমাণ বিদ্যুতশক্তি খরচ হচ্ছে প্লেট-সার্কিট থেকে টিউনিং কয়েল ঠিক ততটুকু শক্তি ফিরে পাচ্ছে। মনে আছে নিশ্চয়ই আগে

বলেছিলাম যে, এধরনের যোগানদার ব্যবস্থায় যে কোনো টিউনিং সার্কিটে আপনা থেকে বরাবর স্থায়ী সমান জোরের দিকফিরতি বিদ্যুত বা অসিলেশন সৃষ্টি হয়। ট্রান্সমিটারের অসিলিটর সার্কিট এভাবেই তৈরী করা হয়। অসিলেশন সুরু হলে কিন্তু তুমি টেলিফোনে আর কোন শব্দ শুনতে পারে না।

পরস্পর দুটো তিনটে বা তার বেশী টিউব বসিয়ে তৈরী করা এ. এফ. ভোল্টেজ-অ্যাম্‌প্লিফায়ার সার্কিটে আপনা থেকে অসিলেশন হবার সম্ভাবনা খুব বেশী। সবগুলি টিউবের প্লেট একই B-ব্যাটারীতে লাগানো হয় বলে শেষের ধাপের টিউব-গুলির অ্যাম্‌প্লিফাই করা দিকফিরতি ভোল্টেজের খানিকটা ব্যাটারীর মারফত আগের ধাপের টিউবে পৌঁছে ফিড্‌ব্যাক সৃষ্টি করতে পারে। অ্যাম্‌প্লিফায়ার সার্কিটে অসিলেশন হবে তা আমরা চাই না। তাই অসিলেশন বন্ধ করার জন্য কোনো রকম ব্যবস্থা করা দরকার। প্রত্যেক টিউবের জন্য আলাদা B-ব্যাটারী করলে অসিলেশন হবে না কিন্তু এতে অনেক খরচ পড়ে। তাই এর বদলে অন্য রকম ব্যবস্থা করা হয়। প্লেট-লোড আর B-ব্যাটারীর মাঝখানে আর একটা রেসিস্ট্যান্স জুড়ে দেওয়া হয়। দুটো রেসিস্ট্যান্সের মাঝখান থেকে B-ব্যাটারীর নেগেটিভে একটা বেশী ক্যাপাসিটির কন্‌ডেন্‌সার জুড়ে দেওয়া হয়। দিকফিরতি বিদ্যুতের পথে কন্‌ডেন্‌সারের বাধা খুব কম। তাই অ্যাম্‌প্লিফাই-করা দিকফিরতি কারেন্ট B-ব্যাটারীর ভেতর দিয়ে না গিয়ে কন্‌ডেন্‌সারের ভেতর দিয়ে সরাসরি ক্যাথোডে চলে আসতে পারে। সব টিউবের প্লেটে

এই ব্যবস্থা করলে আর এ. এফ. অ্যাম্প্লিফায়ারে ফিড্-ব্যাক হয় না। এই ব্যবস্থাকে বলে ডিকাপলিং।

কিন্তু ট্রায়োড দিয়ে আর. এফ. অ্যামপ্লিফায়ারে আপনা থেকেই ফিড্-ব্যাক হবার সম্ভাবনা থাকে। তার কারণ গ্রিড ও প্লেটের মধ্যে খুব অল্প খানিকটা ক্যাপাসিটি থাকে। এই ক্যাপাসিটির মারফত প্লেট-সার্কিট থেকে গ্রিড-সার্কিটে ফিড্-ব্যাক হতে পারে। এ ধরনের ফিড্-ব্যাক বন্ধ করার জন্যে নতুন একধরনের টিউব তৈরী করতে হয়েছে, তাকে বলে টেট্রোড। টেট্রোডে গ্রিড প্লেটের মাঝখানে আরও একটা তারের জাল বসিয়ে দেওয়া হয়। একে বলে স্ক্রীন গ্রিড। তাতে প্লেট থেকে কিছু কম পজিটিভ ভোল্টেজ দিয়ে রাখা হয় আর স্ক্রীন থেকে ক্যাথোড পর্যন্ত একটা কন্‌ডেন্‌সার জুড়ে দেওয়া হয়।
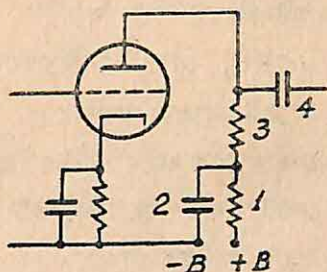
—70—

ডিকাপলিং

1—ডিকাপলিং রেসিস্ট্যান্স
2—ডিকাপলিং কন্‌ডেন্‌সার
3—প্লেটলোড। 4—কাপলিং কন্‌ডেন্‌সার

এধরনের ব্যবস্থা করলে প্লেট থেকে গ্রিডে কোনো ফিড্-ব্যাক হতে পারে না। টেট্রোডে অ্যাম্প্লিফিকেশনও ট্রায়োড থেকে অনেক বেশী হয়।

ক্যাথোড থেকে ছুটে-আসা ইলেকট্রনরা প্লেটের গায়ে ধাক্কা মারলে তার থেকে অনেক ইলেকট্রন ছিট্‌কে বেড়িয়ে পড়ে। ডায়োড বা ট্রায়োডে ছিট্‌কে-আসা ইলেকট্রনরা

আবার প্লেটেই ফিরে যায়। কিন্তু টেট্রোডে এদের অনেকে স্ক্রীন গ্রিডে চলে আসে, স্ক্রীন পজিটিভ বলে। তার ফলে প্লেট-কারেণ্ট কমে যায়। এতে লাউডস্পিকার বাজানোর অসুবিধা, কারণ লাউডস্পিকার বাজাতে যতবেশী সম্ভব কারেণ্ট পাওয়া দরকার। তাই লাউডস্পিকার বাজানোর জন্য আরেক ধরনের টিউব তৈরী করা হয়। তাতে স্ক্রীন আর প্লেটের মাঝখানে আরেকটা গ্রিড জুড়ে তাকে ক্যাথোডের সাথে লাগিয়ে দেওয়া হয়। এই গ্রিডটাকে বলে 'সাপ্রেসর'। ক্যাথোড নেগেটিভ বলে সাপ্রেসরও নেগেটিভ। তাই প্লেট থেকে ছিট্‌কে-আসা ইলেকট্রনরা এর ভেতর দিয়ে স্ক্রীনে পৌঁছাতে পারে না। এই ধরনের টিউবকে বলে পেন্‌টোড। পেণ্টোডে অ্যাম্‌প্লিফিকেশন ট্রায়োড বা টেট্রোডের থেকে বেশী হতে পারে। শুধু যে লাউডস্পিকার বাজানোর জন্যেই পেণ্টোড ব্যবহার করা হয় তা নয়, আর. এফ. অ্যাম্‌প্লিফায়ার হিসেবেও পেণ্টোড ব্যবহার করা হয়। আজকালকার রেডিওতে পেণ্টোডের ব্যবহারই সব থেকে বেশী।
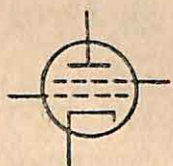
—71— ট্রেটোড
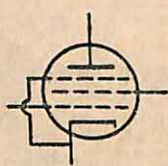
—72— পেণ্টোড

রেডিওতে মোটামুটি যে ধরনের টিউব ব্যবহার করা হয় সেগুলোর কথা বললাম। এছাড়াও তিন-টের বেশী গ্রিড বসিয়ে আরো নানা রকম টিউব তৈরী করা হয়। সেগুলোর কথা আর এখানে কিছু বলবো না। অনেক সময় একই ঢাকনার ভেতরে দুটো

ডায়োড অথবা ছুটো ট্রায়োড অথবা একটা ডায়োড ও একটা ট্রায়োড ইত্যাদি বসিয়েও নানা রকম টিউব তৈরী করা হয়। এদের প্লেট, গ্রিড ইত্যাদি আলাদা হ'লেও ফিলামেণ্ট বা ক্যাথোড অনেক সময় একই হয়।

এখানে যে সব টুকরো টুকরো সার্কিটের কথা বললাম এইগুলো পর পর বসিয়েই একটা পুরো রেডিও তৈরী হ'তে পারে। একটা, ছুটো বা তিনটে টিউবের রেডিও তুমিও ইচ্ছে করলে তৈরী করতে পার। বইয়ের শেষের দিকে যে সব রেডিও তুমি তৈরী করবে সেগুলোর সব খুঁটি-নাটির কথা বলেছি। নকশাগুলো দেখলেই বুঝতে পারবে। কিন্তু হাতে-কলমে কাজ করার আগে আরো অনেক কথা জানা দরকার, যে সব কথা না জানলে তুমি কোনদিনই একটা পুরো রেডিও তৈরী করতে পারবে না। সে সব কথা এবার বলবো।

—73—
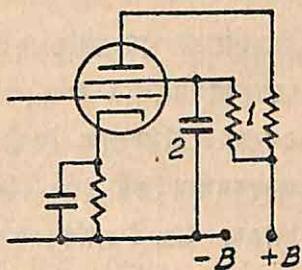
টেট্রোড অ্যাম্প্লিফায়ার

1—রেসিস্ট্যান্সের মারফৎ স্ক্রীনগ্রিডে ভোল্টেজ দেওয়া হচ্ছে। 2—স্ক্রীন বাইপাস কনডেন্সার

১২

মালমশলা

হাতেকলমে রেডিওর কাজ করতে গেলেই প্রথমে জানতে হবে মালমশলার কথা। জানতে হবে কত মাপের কত রকমের রেসিস্ট্যান্স তৈরী হয়। কত রকমের কত মাপের কন্‌ডেন্‌সার তৈরী হয়। কি কি ধরনের টিউব বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, ইত্যাদি। তার পর জানতে হবে কোথায় কোন্ মাপের রেসিস্ট্যান্স, কন্‌ডেন্‌সার, সার্কিটের কোথায় কি কি টিউব ব্যবহার করতে হয়, সে সব কথা। এগুলো জানলে নকশা দেখে দেখে রেডিও তৈরী করা যায়।

প্রথমে বলবো জুড়বার তারের কথা। জুড়বার তারের ওপরে রবার বা প্লাস্টিকের ইনস্যুলেশন দেওয়া থাকে। এগুলোর ভেতরকার তার তামার। ব্যবহার করবার আগে তারের তু'মাথায় বাইরের ইনস্যুলেশন ছুরি বা ব্লেড দিয়ে কেটে নিতে হয়। এছাড়া টিউনিং কুণ্ডলী ও নানারকম ট্রান্সফর্মার তৈরী করতেও অনেক রকমের ইনস্যুলেট-করা তার লাগে। কতগুলো তার দেখতে তামার তারের মতই কিন্তু তাদের উপরে গালার বার্নিশের ইনস্যুলেশন থাকে। এগুলোকে বলে এনামেল-করা তামার তার। রেডিওর ট্রান্সফর্মারে ও টিউনিং কুণ্ডলীতে এধরনের তার ব্যবহার করা হয়। এর ইনস্যুলেশন খুব পুরু নয় বলে খুব অল্প জায়গাতেই অনেক

পাক জড়ানো যায়। এ ধরনের তার ব্যবহার করার আগেও মনে রেখ ব্লেড বা মিহি শিরিষ কাগজ দিয়ে দু'মাথার ইনস্যুলেশন চেঁছে নিতে হবে। এছাড়া সিল্কের সুতো বা সাধারণ সুতো দিয়ে জড়িয়েও ইনস্যুলেশন তৈরী করা হয়। এ ধরনের চার রকম তার পাওয়া যায়। তাদের নাম—S. S. C. (Single Silk Covered) অর্থাৎ একপ্রস্থ রেশমের সুতো জড়ানো, D. S. C. (Double Silk Covered) অর্থাৎ দু'প্রস্থ রেশমের সুতো জড়ানো, S. C. C. (Single Cotton Covered) অর্থাৎ একপ্রস্থ সুতো জড়ানো, D. C. C. (Double Cotton Covered) অর্থাৎ দু'প্রস্থ সুতো জড়ানো। এসব তার রেডিওর আর. এফ. ট্রান্সফর্মার, টিউনিং কুণ্ডলী ইত্যাদি জড়ানোর কাজে ব্যবহার করা হয়।

সরু মোটা নানান মাপের তার বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। কোন্ তার কতখানি সরু বা মোটা, তা বোঝান হয় তারের নম্বর দিয়ে। নম্বরটাকে বলে 'গেজ'। তার সরু হলে গেজের নম্বর বেশী হয়। সরু তারের ভেতর দিয়ে বেশী কারেন্ট গেলে তার পুড়ে যায়। তার কারণ, সরু তারের রেসিস্ট্যান্স সমান দৈর্ঘ্যের মোটা তারের থেকে বেশী। রেসিস্ট্যান্স বেশী হ'লে ওয়াটেজ বেশী হয়। মনে আছে নিশ্চয়ই ওয়াটেজ= (কারেন্ট)^2 × রেসিস্ট্যান্স। যেখানে তারের ভেতর দিয়ে বেশী কারেন্ট যায় সেখানে মোটা তার ব্যবহার করা হয়, কম কারেন্ট গেলে সরু তার ব্যবহার করা হয়। কোন্ গেজের তারে সব চেয়ে বেশী কত অ্যাম্পেয়ার কারেন্ট যেতে পারে তার হিসেব পরিশিষ্টে লেখা আছে।

রেডিও সারকিটে রেসিস্ট্যান্স ব্যবহার করা হয় নানা মাপের, কয়েক শত ওম থেকে কয়েক মেগোম পর্যন্ত। তার জড়িয়ে কয়েক মেগোম রেসিস্ট্যান্স তৈরি করতে গেলে আয়তনে প্রকাণ্ড বড় হবে, খরচও পড়বে অনেক বেশী। তাই কার্বন বা কয়লা দিয়ে সাধারণত রেডিওর রেসিস্ট্যান্স তৈরি করা হয়। এরা আয়তনে খুব ছোট কিন্তু রেসিস্ট্যান্স কয়েক মেগ পর্যন্ত হতে পারে। এদের দামও খুব কম। ওয়াটেজ সাধারণত হয় $\frac{1}{4}$ ওয়াট, $\frac{1}{2}$ ওয়াট, 1 ওয়াট······5 ওয়াট পর্যন্ত। তার চেয়ে বেশী ওয়াটেজ যেখানে দরকার, সেখানে নিক্রোম বা অন্য মিশ্র ধাতু দিয়ে তৈরি সরু রেসি-স্ট্যান্স তার-জড়ানো রেসিস্ট্যান্স ব্যবহার করা হয়।

কন্‌ডেন্‌সার ব্যবহার করা হয় কয়েক পিকোফ্যারাড থেকে কয়েক মাইক্রোফ্যারাড পর্যন্ত। খুব কম ক্যাপাসিটির কন্‌ডেন্-সারগুলোর দুটো পাতের মধ্যে অভ্র বা মাইকার পাতলা পাত ইনস্যুলেটর হিসাবে বসানো থাকে। এদের বলে মাইকা কন্‌ডেন্‌সার। 41 পৃষ্ঠায় কন্‌ডেন্‌সারের যে ছবি আছে তার ধাতুর পাতগুলোর ভিতরে মাইকা বসিয়ে দিলেই মাইকা কন্‌ডেন্‌সার হলো। তার চেয়ে বেশী ক্যাপাসিটির কন্‌ডেন্‌সার মাইকার বদলে দুটো এ্যালুমিনিয়ামের পাতের ভেতর মোম-মাখানো কাগজ দিয়ে সবটাকে গোল করে জড়িয়ে নিয়ে তৈরি করা হয়। এদের বলে পেপার কন্‌ডেন্‌সার বা কাগজের কন্‌ডেন্‌সার। 74 নং ছবি দেখ। খুব বেশী ক্যাপাসিটির কন্‌ডেন্‌সার অন্যভাবে তৈরি হয়। তার ভেতরকার কথা এখানে বললাম না। এদের বলে 'ইলেকট্রোলিটিক

কন্‌ডেন্‌সার'। এদের একটা মাথায় + ও অন্য মাথায় − চিহ্ন দেওয়া থাকে। + প্রান্ত পজিটিভ তারে ও − প্রান্ত নেগেটিভ তারে লাগাতে হয়। উল্টো লাগালে ইলেকট্রোলিটিক কন্‌ডেন্‌সার খারাপ হ'য়ে যায়।

সব কন্‌ডেন্‌সারের গায়েই একটা ভোল্টেজ লেখা থাকে। কন্‌ডেন্‌সারের ছু'পাতের মধ্যে ভোল্টেজ এর চেয়ে বেশী হলে
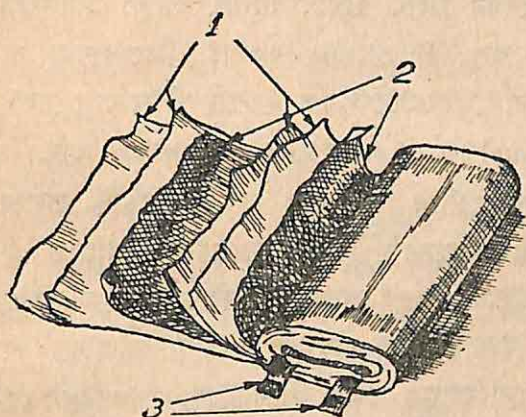
—74—

পেপার কন্‌ডেন্‌সারের ভেতরকার ছবি
1—মোম-মাখানো ইনস্থ্যলেটর কাগজ,
2—ধাতুর পাতলা পাত, 3—টার্মিনাল।

ইন্‌স্থ্যলেটার খারাপ হয়ে কন্‌ডেন্‌সারের ছুটো পাতের মধ্যে শর্ট সার্কিট হয়ে যায়। তাই কন্‌ডেন্‌সার লাগাবার আগে দেখে নিতে হয় তার ছু'মাথায় ডি. সি. ভোল্টেজের তফাৎ কত হবে। এই যে সব কন্‌ডেন্‌সারের কথা বললাম, এদের ক্যাপাসিটি বাড়ানো বা কমানো যায় না। টিউনিং-এর জন্যে

যে কন্‌ডেন্‌সার দরকার, তার ক্যাপাসিটি ইচ্ছেমত বাড়ানো কমানো চলে সে রকম ব্যবস্থা থাকে।

অনেক ধরনের রেডিও টিউব বাজারে পাওয়া যায়। কারো ফিলামেণ্ট গরম করার জন্য বেশী ভোল্টেজ দরকার। কারোর জন্যে কম ভোল্টেজের B-ব্যাটারী দরকার। কোনটার বা অ্যাম্‌প্লিফিকেশন বেশী। প্রত্যেক টিউবেরই একটা করে নাম থাকে যেমন 1R5, 1N5, 6SJ7, 3Q5 ইত্যাদি। কোন্‌ টিউবে কত B-ভোল্টেজ দরকার, গ্রিড-বায়াস্‌ কত থাকা দরকার, প্লেট-কারেণ্ট কত ইত্যাদি 'টিউব ম্যানুয়েল' (Tube Manual) নামে এক ধরনের বইয়ে পাওয়া যায়। এ বইতে যে সব রেডিও সার্কিটের নকশা দিয়েছি তাদের টিউবের নাম ও এ ধরনের খুঁটিনাটি খবর এখানেই পাবে।

টিউবের ভেতর থেকে প্লেট, গ্রিড ফিলামেণ্ট ইত্যাদি তার দিয়ে টিউবের নীচে কতগুলি আলাদা আলাদা পিনের সঙ্গে লাগানো থাকে। কোন্‌ পিনে গ্রিড, কোন্‌ পিনে প্লেট ইত্যাদি লাগানো রয়েছে সে খবরও টিউব ম্যানুয়েলে পাওয়া যায়। কোন কোন টিউবের ওপরে একটা ধাতুর টুপি থাকে। তাতে সাধা-রণত গ্রিড লাগানো থাকে। টিউব বসানো হয় এক ধরনের হোল্ডারে। তাতে এক একটা পিন এক এক জায়গায় বসে। হোল্ডারের তলায় কতগুলি টার্মিনাল রয়েছে। তাতে রেসি-স্ট্যান্স, কন্‌ডেন্‌সার ইত্যাদি লাগানো হয়। টিউবহোল্ডারে এমন ব্যবস্থা আছে যে টিউবের পিনগুলি একভাবেই হোল্ডারে বসবে। এরকম ব্যবস্থা থাকায় ভুল করে গ্রিডের টার্মিনালে প্লেট বা প্লেটের টার্মিনালে ফিলামেণ্টের পিন বসবার সম্ভাবনা

কোন কোন টিউবের গ্রিড তীর-চিহ্নিত ধাতুর টুপিতে লাগানো থাকে।

—75—

—76—
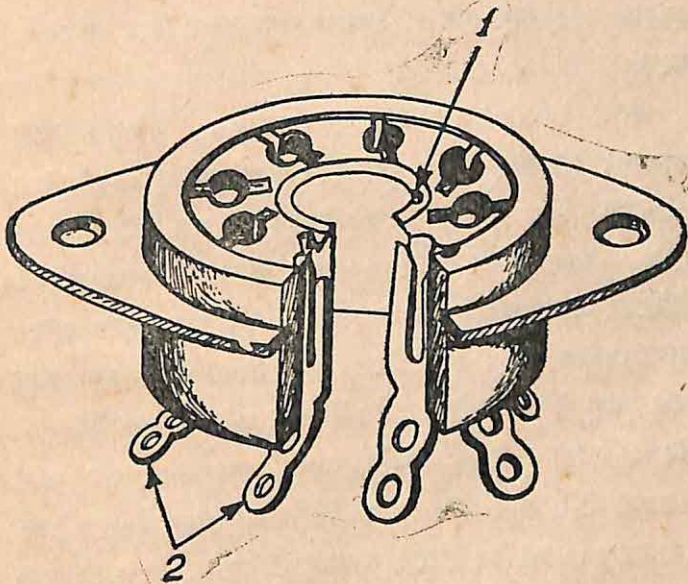
8 পিনের টিউব বসাবার হোল্ডার (বড় করে আঁকা)। হোল্ডারের গর্তগুলিতে টিউবের বেস-পিনগুলি (তলাকার পিন) বসবে। 1—হোল্ডারের গায়ে কাটা খাঁজ ; টিউবের বেসের শিরটি এতে বসবে। 2—রেসিস্ট্যান্স, কন্‌ডেন্‌সার ইত্যাদি এই টার্মিনালগুলিতে ঝালা দিয়ে লাগানো হয়।

থাকে না। আগের পাতার ছবি দেখলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে।

সব শেষে যে কথাটা বলছি রেডিওর কাজ করতে গেলে সেটাই হলো সব চেয়ে দরকারী কথা। রেডিওতে যে কোন দুটো তার জুড়তে হ'লেই তার দুটো জড়িয়ে ঝালা দিয়ে দিতে হয়। রেডিও সার্কিটে সব কিছুই জুড়তে গেলে ঝালা দিয়ে দিতে হয়। টিউব হোল্ডারের তলার টার্মিনালে জুড়বার তার কন্‌ডেন্‌সার ইত্যাদি সব ঝালা দিয়ে লাগানো থাকে।

ঝালা দেবার একরকম যন্ত্র আছে। বাংলায় বলে 'তাতাল', ইংরাজীতে বলে 'সোলডারিং আয়রন' (Soldering Iron)। এর ভেতরে ইলেক্‌ট্রিক ইস্ত্রির মত হিটারের তার থাকে। ইলেক্‌ট্রিক লাইনের প্লাগে লাগিয়ে দিলে কয়েক মিনিটেই তাতালের সামনের দিকটা খুব গরম হয়ে যায়। ঝালা দেবার রাংকে ইংরাজীতে বলে Solder। এক রকম মিশ্র ধাতু দিয়ে সোলডার তৈরী হয়, তাতে থাকে খানিকটা টিন খানিকটা সীসে। কাজ করার জন্যে সব থেকে ভাল শতকরা 60 ভাগ টিন আর 40 ভাগ সীসে দিয়ে তৈরী সোলডার। তা না পেলে শতকরা 50 ভাগ টিন ও 50 ভাগ সীসের তৈরী সোলডার কিনবে। এগুলো সাধারণত 18, 16 বা 14 গেজের তারের আকারে বিক্রি হয়। কোন কোন সোলডার এর ভেতরে রজন দেওয়া থাকে। তাকে বলে Rosin-Cored Solder। ঝালার কাজে এগুলি সব চেয়ে ভাল।

ঝালা দিতে হ'লে অন্তত 65 ওয়াটের তাতাল নিয়ে কাজ করলে সুবিধা হয়। ঝালা দেবার আগে তারগুলোকে ব্লেড দিয়ে ভাল করে চেঁছে নেওয়া দরকার। তারপর জুড়বার সবগুলো তার একসঙ্গে পেঁচিয়ে খানিকক্ষণ তাতে তাতালের গরম জায়গাটা ঠেকিয়ে রাখতে হয়। তারপর যথেষ্ট গরম হ'লে তাতালের মুখে খানিকটা সোলডার ঠেকালে আপনা থেকেই গলে তারের গায়ে লেগে যাবে। তখন তাতাল সরিয়ে নিতে হয়। ঝালা দেবার ব্যাপার যদি পাড়ার রেডিওর দোকানে গিয়ে কয়েকদিন দেখে নাও তাহ'লে ভাল শিখতে পারবে।

রেডিওর কাজ করতে গেলে তাতাল তোমাকে কিনতেই হবে। তাছাড়া দরকার স্ক্রু-ড্রাইভার, প্লায়ারস্ ইত্যাদি ছোট-খাট যন্ত্রপাতি।

সব-কিছু মালমশলাই তুমি রেডিওর দোকানে কিনতে পাবে।

১৩

নিজের হাতে তৈরী রেডিও

এবার কয়েকটি পুরো রিসিভার সারকিটের নকশা দেব। নকশা দেখে কি করে এইসব রেডিও তুমি নিজে তৈরী করতে পার সেকথাও এখানে বলবো।

এক টিউবের রিসিভার

এই রিসিভারটি হ'ল 66 নং চিত্রের রিসিভারের রকমফের। এতে মিডিয়াম-ওয়েভে পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত দূরের ট্র্যান্সমিটারের প্রোগ্রাম এবং শর্ট-ওয়েভে আরো দূরের ট্র্যান্সমিটার ভালোই শোনা যাবে।

IT4 টিউবটি এখানে গ্রিড-লিক ডিটেক্‌টরের কাজ করছে। L_2 কুণ্ডলী আর C_1 ভেরিএব্‌ল কন্‌ডেন্‌সার মিলে হ'ল টিউনিং সারকিট। C_2 কন্‌ডেন্‌সার ও R রেসিস্ট্যান্সটি থাকার জন্য গ্রিড-লিক ডিটেক্‌শন হচ্ছে। R গ্রিড-লিক রেসিস্ট্যান্সটি এখানে যেভাবে C_2 কন্‌ডেন্‌সারের প্যারালালে রয়েছে সে ভাবে না লাগিয়ে 66 নং ছবির রেসিস্ট্যান্সের মত গ্রিড আর ফিলামেণ্টের নেগেটিভ প্রান্তেও লাগানো চলে। IT4 টিউবের স্ক্রীন-গ্রিড সরাসরি B-ব্যাটারীর + প্রান্তে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, আর সাপ্রেসর টিউবের ভেতরেই ফিলামেণ্টের সাথে লাগানো রয়েছে।
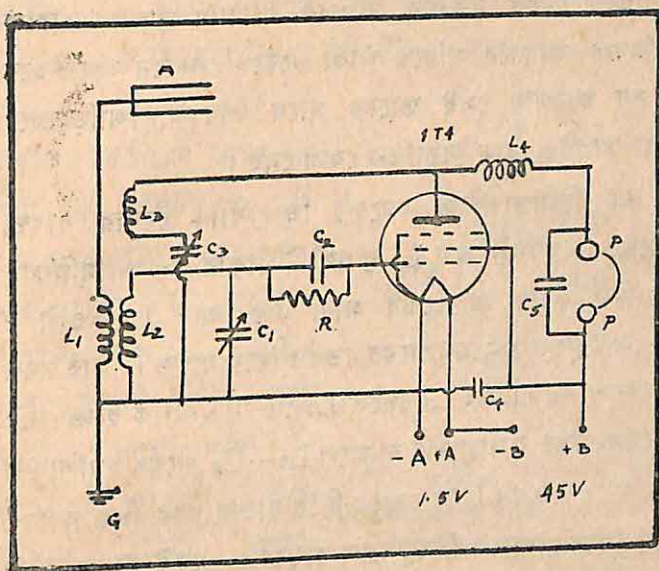
—77—

এক-টিউবের রিসিভার

A—এরিয়েল। L_1—এরিয়েল কুণ্ডলী। L_2—টিউনিং কুণ্ডলী। L_3—ফিড্-ব্যাক কুণ্ডলী। G—মাটিতে লাগানো তার। PP—হেডফোন। A—1·5 ভোল্ট ব্যাটারী। B—45 ভোল্ট ব্যাটারী।

$C_1 = 500$ পিকোফ্যারাড ভেরিএব্‌ল কন্‌ডেন্‌সার।

$C_2 = 250$ পিকোফ্যারাড মাইকা কন্‌ডেন্‌সার।

$C_3 = 300$ পিকোফ্যারাড ভেরিএব্‌ল কন্‌ডেন্‌সার।

$C_4 = \cdot 1$ মাইক্রোফ্যারাড পেপার কন্‌ডেন্‌সার।

$C_5 = 200$ পিকোফ্যারাড মাইকা কন্‌ডেন্‌সার।

$R = 2$ মেগোম কার্বন রেসিস্ট্যান্স, $\frac{1}{2}$ ওয়াট।

$L_4 = 8$ মিলিহেনরী আর-এফ চোক বা ইনডাক্‌ট্যান্স।

এখন থেকে নকশার যে সব জায়গায় জুড়বার তারকে অর্ধবৃত্তের আকারে ঘুরিয়ে আঁকা হয়েছে সেখানে বুঝতে হবে সে সব জায়গায় সেই তারের সাথে তার আড়াআড়ি ভাবে আঁকা তারটির কোন বৈদ্যুতিক যোগ নেই।

এই রিসিভারটিতে কমবেশী ফিড্-ব্যাক দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। প্লেট-সার্কিটে L_4 কুণ্ডলীটি থাকার জন্য অ্যাম্‌প্লিফাই করা দিক-ফিরতি কারেণ্টের আর. এফ. অংশ L_3 কুণ্ডলী ও C_3 ভেরিএব্‌ল কন্‌ডেন্‌সারের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। তার ফলে ইনডাক্‌শনের মারফৎ L_3 থেকে L_2-তে ফিড্-ব্যাক হচ্ছে। C_3 কন্‌ডেন্‌সারের ক্যাপাসিটি বাড়ালে L_3-C_3 পথের ইম্‌পিডেন্স কমে যাবে। তখন L_3'র ভেতর-দিয়ে-যাওয়া আর. এফ. কারেণ্ট বেড়ে যাবে। তাতে ফিড্-ব্যাক বাড়বে। একই কারণে C_3'র ক্যাপাসিটি কমালে ফিড্-ব্যাক কমবে। ফিড্-ব্যাক বাড়িয়ে কমিয়ে হেডফোনে শোনা আওয়াজের জোর বাড়ানো কমানো চলে। ফিড্-ব্যাক বেশী বাড়ালে কিন্তু সার্কিটে আর. এফ অসিলেশন তৈরী হবে। তখন হেডফোনে শুধু চিঁ চিঁ শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাবে না। তাই ফিড্-ব্যাকের ব্যবস্থা থাকলে সব সময় লক্ষ্য রাখতে হয় যেন ফিড্-ব্যাক বেশী হয়ে অসিলেশন না হয়।

হেডফোনের প্যারালালে যে C_5 কন্‌ডেন্‌সারটি রয়েছে সেটি বাদ দিলেও চলে।

এবার এই রেডিওটি তৈরী করার খুঁটিনাটি শিখে নাও। 77 নং ছবির তলার ফর্দ দেখে প্রথমে রেডিওর দোকান থেকে মালমশলা কিনে নাও। এরিয়েলের 'তার অন্তত 50 ফুট

কিনবে। এ ছাড়া তোমার দরকার হবে একটা 'শাসি' (Chassis) অর্থাৎ যার উপরে তুমি টিউব, কন্‌ডেন্‌সার ইত্যাদি বসাবে। একটা বিস্কুট বা চকোলেটের টিনের ডালা বাদ দিয়ে বাকী অংশটাকেও শাসি হিসেবে ব্যবহার করতে পার। আর দরকার IT4 এর জন্য 7-পিনের হোল্ডার। L_1, L_2, ও L_3 কুণ্ডলী তিনটি একই নলের উপরে কাছাকাছি জড়ানো থাকে। এই তিনটিকে একসঙ্গে মিলিয়ে বলবো টি উ নিং কু ণ্ড লী। টিউনিং কুণ্ডলী তুমি দোকান থেকে কিনতেও পারো অথবা নিজেও বানাতে পারো। যদি নিজে বানাতে চাও তবে প্রথমে এই মালমশলাগুলি কিনে নাও—তিনটি 6-পিনযুক্ত $1\frac{1}{2}''$ ব্যাসের কুণ্ডলী জড়াবার নল (Coil Form), একটা 6-পিন সকেট, 36 ও 26 গেজের এনামেল-করা তামার তার। 125 পৃষ্ঠার ছকে যত পাক

—78—
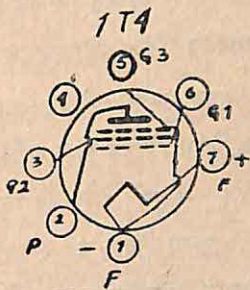
1T4 টিউবের তলাকার কোন্ কোন্ পিনে ফিলামেণ্ট, গ্রিড, প্লেট ইত্যাদি লাগানো রয়েছে তার ছবি (Base connection diagram)
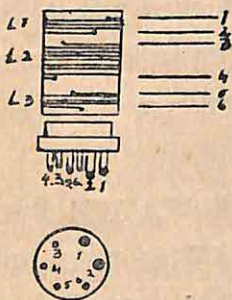
—79—

টিউনিং কুণ্ডলী: এই ছবিতে কোন্ তার তলার কোন্ পিনে লাগবে দেখানো রয়েছে।

জড়াবার কথা বলা রয়েছে সেভাবে 79 নং ছবি দেখে জড়িয়ে নাও। নলের গায়ে ছিদ্র করে প্রত্যেকটি কুণ্ডলীর তারের প্রান্ত নলের ভেতর দিয়ে এনে নলের নিচের পিনগুলির ভেতরকার ছিদ্র দিয়ে বের করে নিয়ে এস। এমনি করে সব তার বের করা হ'লে, প্রত্যেক তারের প্রান্তের ইনস্যুলেশন চেঁছে নিয়ে নিচের পিনগুলির সঙ্গে ঝালা দিয়ে আটকে দিলেই টিউনিং কুণ্ডলী তৈরী হ'ল। মিডিয়াম ও শর্ট-ওয়েভের জন্য এরকম অন্তত তিনটি কুণ্ডলী জড়াতে হবে। প্রথমে মিডিয়াম ওয়েভের কুণ্ডলীটি জড়িয়ে নিয়ে রেডিওটি তৈরি করে পরীক্ষা কর।

প্রথমে L_3 কুণ্ডলীটির হু'মাথা তার দিয়ে শর্ট সার্কিট করে মিডিয়াম ওয়েভের স্টেশন টিউন করবে। এবার L_3 কুণ্ডলীর শর্ট সার্কিট খুলে দিলে ফিড্-ব্যাক হবে। যদি দেখ যে তাতে আওয়াজ কমে যায় তাহ'লে বুঝতে হবে L_3 কুণ্ডলীর কানেকশন উল্টে দিতে হবে। অর্থাৎ এখন যে প্রান্ত, প্লেটে সেটি $+$ Bতে আর যে প্রান্ত $+$ Bতে, তা লাগবে প্লেটে। যদি C_3 কন্ডেন্-সারের হাতল ঘোরালে চিঁ চিঁ শব্দ হয় তবে L_3 কুণ্ডলীর তারের পাকের সংখ্যা কিছু কমিয়ে নিও।

প্রথমে শাসিতে হুটো গোল ছিদ্র করে 1T4 টিউবের হোল্ডার ও টিউনিং কুণ্ডলীর 6-পিনের হোল্ডার বসিয়ে নাও। হোল্ডারগুলির তলার পিন থাকবে শাসির ভেতর দিকটাতে। এবার শাসিকে উল্টে নিয়ে 80নং ছবিতে যে ভাবে আঁকা রয়েছে সেভাবে রেসিস্ট্যান্স, কন্ডেন্সার ইত্যাদি শাসির তলায় ঝালা দিয়ে জুড়ে নাও। শাসির পাশে হুটো করে

টিউনিং কুণ্ডলীর তারের পাকের সংখ্যা

ওয়েভ-ব্যাণ্ড	L_1	L_1 ও L_2'র মধ্যে তফাৎ	L_2	L_2 ও L_3'র মধ্যে তফাৎ	L_3
মিডিয়াম ওয়েভ 200-550 মিটার	36 গেজের কাছাকাছি জড়ানো 25 পাক	$\frac{1}{8}''$	36 গেজের কাছাকাছি জড়ানো 50 পাক	$\frac{1}{8}''$	36 গেজের কাছাকাছি জড়ানো 20 পাক
শর্ট-ওয়েভ 49-100 মিটার	26 গেজের কাছাকাছি জড়ানো 10 পাক	$\frac{1}{4}''$	26 গেজের কাছাকাছি জড়ানো 18 পাক	$\frac{1}{8}''$	26 গেজের কাছাকাছি জড়ানো 10 পাক
শর্ট-ওয়েভ 19-49 মিটার	26 গেজের কাছাকাছি জড়ানো 3 পাক	$\frac{1}{4}''$	26 গেজের কাছাকাছি জড়ানো 6 পাক	$\frac{1}{4}''$	26 গেজের কাছাকাছি জড়ানো 4 পাক

ছিদ্র করে একদিক B-ব্যাটারীর তার, একদিকে A-ব্যাটারীর তার ও হেডফোনের তার এবং অন্যদিকে এরিয়েল ও মাটিতে লাগাবার তার বের করে নাও। 6-পিন হোল্ডারের কাছে দুটো ছিদ্র করে কুণ্ডলীর নিচের থেকে C_1 ও C_3 কন্‌ডেন্‌সারে লাগাবার তার বের করে নাও। এবার শাসিটাকে উল্টে নিয়ে
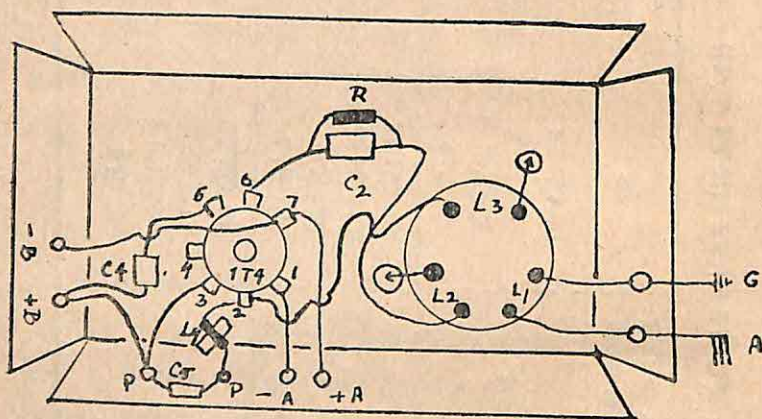
—30—

শাসির তলার কানেকশনের চেহারা

শাসির উপরে 1T4 টিউব এবং টিউনিং কুণ্ডলীর পাশে C_1 ও C_3 কন্‌ডেন্‌সার দুটোকে স্ক্রু দিয়ে শাসির সাথে আটকে দাও। C_1 ও C_3 ভেরিএব্‌ল কন্‌ডেন্‌সার দুটোর যে পাতগুলি হাতলের সঙ্গে লাগানো রয়েছে অর্থাৎ হাতল ঘোরালে তার সাথে ঘোরে, সেই পাতগুলির সঙ্গে লাগানো টার্মিনালকে তার দিয়ে শাসির সঙ্গে জুড়ে দাও। বাঁকি পাতগুলির সঙ্গে

লাগানো টার্মিনাল ছুটোকে যথাক্রমে L_2 এবং L_3 কুণ্ডলী থেকে বেরিয়ে-আসা তার ছুটির সঙ্গে জুড়ে দাও। সব তার জুড়ে দেবার পর 77নং ও 78নং ছবি দেখে কোথাও ভুল হয়েছে কিনা যাচাই করে নাও। মনে রেখো সব তারই ঝালা দিয়ে জুড়লে ভালো হয়। ঝালা দেবার আগে জুড়বার তারের প্রান্তে $\frac{1}{2}''$ পরিমাণ ইনস্যুলেশন ছুরি বা ব্লেড দিয়ে কেটে নিও।

এরপর A-ব্যাটারীর নেগেটিভ প্রান্ত ও মাটিতে লাগাবার তার শাসির সঙ্গে ঝালা দিয়ে জুড়ে দাও। এবার মাটির সঙ্গে সমান্তরাল করে মাটি থেকে 25-30 ফুট উপরে লম্বা এরিয়েলের তার লাগিয়ে দাও। এরিয়েল যত উঁচু আর লম্বা হবে ততই ভালো। মাটিতে লাগানোর তার ভেজা মাটিতে একটা ধাতুর নল পুঁতে বা জলের কলের নলের সাথে ঝেলে লাগিয়ে দাও।

এবার তোমার রেডিও তৈরী হ'ল। A-ব্যাটারী ও তার-পর B-ব্যাটারী জুড়ে দিয়ে টিউনিং ও ফিড্-ব্যাক কন্‌ডেন্‌সারের হাতল ঘুরিয়ে তুমি হেডফোনে রেডিও স্টেশনের প্রোগ্রাম শুনতে পার। মিডিয়াম-ওয়েভের বদলে শর্ট-ওয়েভ শুনতে হ'লে তোমাকে মিডিয়াম-ওয়েভের কুণ্ডলীটি সকেট থেকে খুলে নিয়ে তার জায়গায় শর্ট-ওয়েভের কুণ্ডলী বসাতে হবে।

—31—
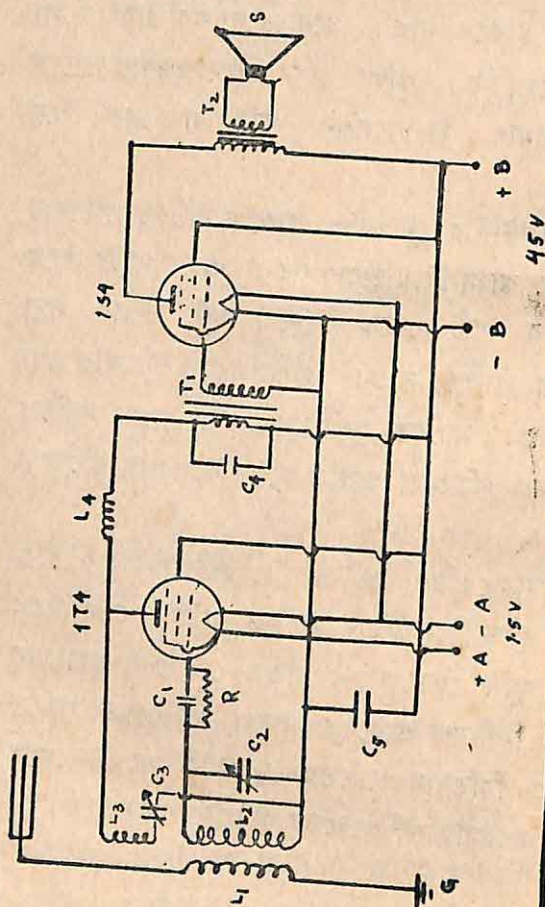
দু-টিউবের রেডিও

L_1, L_2, L_3, L_4, C_1, C_2, C_3, R আগের রেডিওর মত। C_4 = ·05 মাইক্রোফ্যারাড পেপার কন্‌ডেন্‌সার। T_1 = এ. এফ. কাপলিং ট্রান্সফর্মার, প্রাইমারীর পাকের সংখ্যা : সেকেণ্ডারীর পাকের সংখ্যা = 1 : 2। T_2 = লাউডস্পিকার ট্রান্সফর্মার, প্রাইমারীর পাকের সংখ্যা : সেকেণ্ডারীর পাকের সংখ্যা = 20 : 1। S = স্পিকার, 3 ওম ইম্‌পিডেন্স।

দুই ও তিন টিউবের রেডিও

হেডফোনের বদলে লাউড-স্পিকারে শুনতে হ'লে তোমাকে দু'টিউবের রেডিও বানাতে হবে। 81 নং নকশাটি এরকম একটি দু'টিউবের রেডিওর। 77 নং নকশার রেডিওতে এ. এফ অ্যাম্প্লিফিকেশনের জন্য আর একটা টিউব (এখানে IS4) জুড়লেই এই রেডিওটি তৈরী হ'ল। এতে ট্রান্সফর্মার-কাপলিং ব্যবহার করা হয়েছে। এক টিউবের রেডিও বানাবার পরে এই রেডিওটি তুমি নিজেই বানাতে পারবে।

—82—
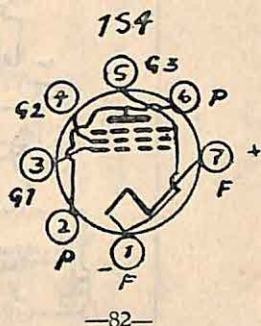
1S4-এর বেসের কানেকশন

83 নং নকশাটি হ'ল একটি তিন-টিউবের রেডিওর। এতে আগের দুটি রেডিও থেকে শর্ট-ওয়েভের প্রোগ্রাম আরও ভালো শোনা যাবে। কিন্তু এই রেডিওটি তৈরী করা একটু শক্ত। এক ও দু'টিউবের রেডিও নিয়ে কাজ করার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা না হ'লে এই রেডিওটি তৈরী করো না।

এই রেডিওতে প্রথম 1N5G টিউবটি আর. এফ. অ্যাম্প্লিফায়ারের কাজ করছে। এর জন্য আর একটি টিউনিং কুণ্ডলী (L_2) দরকার। যতদূর সম্ভব L_2 কুণ্ডলীটি যেন হুবহু L_4 কুণ্ডলীর মত তৈরী করা হয়।
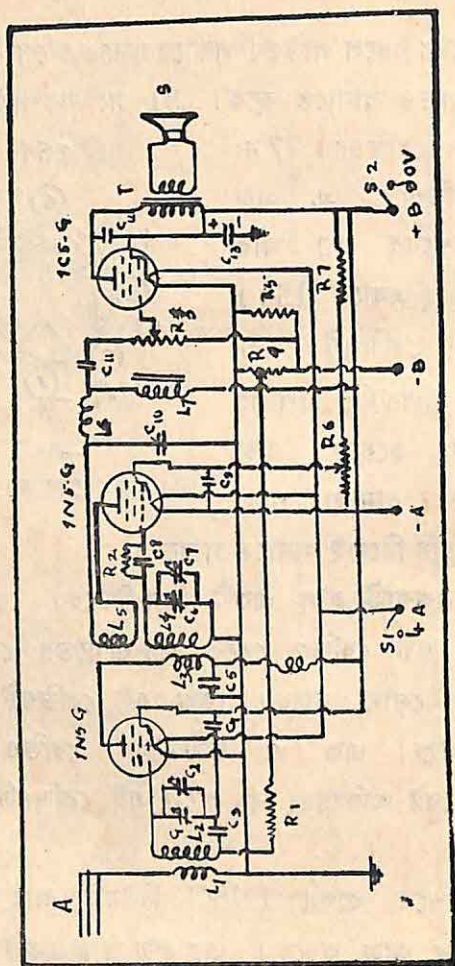
—83—

তিন-টিউবের রেডিও

তিন-টিউবের রেডিওর মালমশলার ফর্দ

A—এরিয়েল। L_1—এরিয়েল কুণ্ডলী। L_2, L_4—টিউনিং কুণ্ডলী। L_3—টিউন-না-করা আর. এফ. প্রাইমারী। L_5—ফিড্-ব্যাক কুণ্ডলী। S—লাউডস্পিকার। $+A, -A$—$1\frac{1}{2}$ ভোল্ট ফিলামেন্ট ব্যাটারী।

$+B, -B$—90 ভোল্ট ব্যাটারী।

L_6,—8 মিলিহেনরী আর. এফ. চোক। T—এ. এফ. আউটপুট ট্রান্সফর্মার, প্রাইমারী : সেকেণ্ডারী = 20 : 1

C_1, C_6	= 500 পিকোফ্যারাড টিউনিং কন্‌ডেন্‌সার	R_1	= ·1 মেগোম (কার্বন), $\frac{1}{2}$ ওয়াট
C_2, C_7	= 35 পিকোফ্যারাড ট্রিমার কন্‌ডেন্‌সার	R_2	= 2 মেগোম (কার্বন), $\frac{1}{2}$ ওয়াট
C_3, C_4, C_5	= ·05 মাইক্রোফ্যারাড পেপার কন্‌ডেন্‌সার	R_3	= ·5 মেগোম পোটেনশিওমিটার
C_8, C_{10}	= 200 পিকোফ্যারাড মাইকা কন্‌ডেন্‌সার	R_4, R_6	= 50,000 ওম পোটেনশিওমিটার
C_9	= ·1 মাইকোফ্যারাড পেপার কন্‌ডেন্‌সার	R_5	= 600 ওম (কার্বন), $\frac{1}{2}$ ওয়াট
C_{11}, C_{12}	= ·002 মাইক্রোফ্যারাড পেপার কন্‌ডেন্‌সার	R_7	= 30,000 ওম (কার্বন), $\frac{1}{2}$ ওয়াট
C_{13}	= 8 মাইক্রোফ্যারাড ইলেকট্রোলিটিক কন্‌ডেন্‌সার	L_7	= 120 হেনরী এ. এফ. চোক

এই রেডিওতে R_3, R_4, R_6 রেসিস্ট্যান্স তিনটি লক্ষ্য কর। এ ধরনের রেসিস্ট্যান্সকে বলে পোটেনশিওমিটার। এতে তিনটি টার্মিনাল ও একটি হাতল থাকে। তীর-চিহ্নিত তারটি
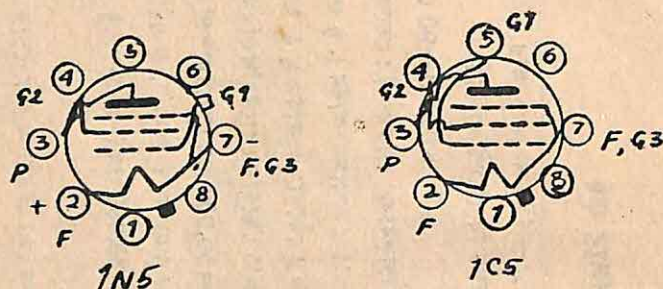
—84—

1N5 ও 1C5-এর বেসের কানেকশন

মাঝের টার্মিনালে লাগবে। হাতল ঘোরালে তীর-চিহ্নিত টার্মিনালটি রেসিস্ট্যান্সে এক মাথা থেকে অন্য মাথায় সরে যায়। এই রেসিস্ট্যান্সগুলির হাতল ঘুরিয়ে তুমি শব্দের জোর বাড়াতে কমাতে পার। R_6 রেসিস্ট্যান্সটি দিয়ে তুমি ফিড্-ব্যাক কমাতে ও বাড়াতে পার।

মিডিয়াম ওয়েভের কোন রেডিও স্টেশন টিউন করে C_2 ও C_7 ট্রিমার কন্ডেন্সার দুটোর স্ক্রু ঘুরিয়ে এমন অবস্থায় আনতে হবে যেন শব্দের জোর সব থেকে বেশী হয়। তবেই L_2 ও L_4 টিউনিং কুণ্ডলী দুটি একই কম্পন-সংখ্যায় টিউন করা হ'ল। রেডিওতে আর. এফ. অ্যাম্প্লিফায়ার থাকলে এভাবে ট্রিমার দিয়ে দুটো কুণ্ডলীর টিউনিংকে মিলিয়ে নেয়াকে বলে 'এলাইন্' (align) করা।

পরিশিষ্ট

১

ইন্‌ডাক্‌ট্যান্স

শুধু নলে জড়ানো কোন কুণ্ডলীর ইন্‌ডাক্‌ট্যান্স এই ফরমুলা থেকে হিসেব করতে পারো—

$$\text{ইন্‌ডাক্‌ট্যান্স} = \cdot0252\frac{d^2N^2/l}{1+\cdot46(d/l)} \text{ মাইক্রোহেনরী।}$$

d = কুণ্ডলীর পাকের ব্যাস (ইঞ্চি)।

N = কুণ্ডলীর পাকের সংখ্যা।

l = কুণ্ডলীর তার-জড়ানো অংশটুকুর দৈর্ঘ্য (ইঞ্চি)।

২

ইম্‌পিডেন্স

রেসিস্ট্যান্স ও ইন্‌ডাক্‌ট্যান্স সিরিজে থাকলে তাদের মোট ইম্‌পিডেন্স $= \sqrt{R^2+(6{\cdot}28fL)^2}$ ওম। R = রেসিস্ট্যান্স (ওম), f = কম্পন-সংখ্যা, L = ইন্‌ডাক্‌ট্যান্স (হেনরী)।

রেসিস্ট্যান্স ও কন্‌ডেন্‌সার সিরিজে থাকলে মোট ইম্‌পিডেন্স $= \sqrt{R^2+(1/6{\cdot}28fC)^2}$ ওম। C = ক্যাপাসিটি (ফ্যারাড)।

এনামেল-করা তামার তার

গেজ S. W. G.	কত অ্যাম্পেয়ার পর্যন্ত কারেণ্ট যেতে পারে Maximum current (amps.)	তারের ব্যাস (ইঞ্চি) Wire diameter (inch.)	প্রতি ইঞ্চিতে কত পাক জড়ানো যায় Turns per inch.
22	50	·030	33
25	30	·022	46
26	25	·020	51
28	20	·016	62
30	15	·013	74
33	10	·011	91
36	7	·009	120
39	4	·006	175

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

এক : বিদ্যুৎ-বিশারদ : দেবীদাস মজুমদার
দুই : মুদ্রণ-বিশারদ : অশোক ঘোষ
তিন : মোটর এঞ্জিনিয়ার : দেবীদাস মজুমদার
চার : বীক্ষণ-বিশারদ : কমলেশ রায়
পাঁচ : বিমান-বিশারদ : দেবব্রত বসু
ছয় : রেডিও-বিশারদ : জ্যোতির্ময় দে
সাত : ফোটোগ্রাফার : কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
ইত্যাদি ইত্যাদি

আমরাও হতে পারি—শুধু তাই নয়, আমাদেরও হতে হবে। কেননা আজ আমাদের দেশ একটা প্রকাণ্ড যুগ-পরিবর্তনের মুখোমুখি এসে পৌঁছেছে—হাজার বছরের পুরোনো যে-অচল খোঁটায় আমাদের ভাগ্য বহুদিন বাঁধা পড়ে ছিলো তা উপড়ে ফেলে বিদেশী শাসনমুক্ত এই দেশকে শিল্পে, ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে হবে। আজ আর যন্ত্রকে ভয় পেয়ে বসে থাকা চলবে না—হাতের কাজকে ছোট মনে করবার, ঘৃণা করবার দিন নয় আর। তাই এই গ্রন্থমালার পরিকল্পনা। যাঁদের দিয়ে বইগুলি লিখিয়েছি তাঁরা প্রত্যেকেই নিজের বিভাগে বিশেষজ্ঞ। তাঁদের বলেছি : আপনাদের ওই জ্ঞানের ঐশ্বর্যই আজ একটা ঋণ হয়েছে—দেশের কিশোর-কিশোরীদের কাছে ঋণ। আপনারা যা জেনেছেন, শিখেছেন তা সহজ করে ওদের বুঝিয়ে দিতে হবে, যাতে যন্ত্র-কৌশলের নানা বিভাগে ওরা সত্যিই আগামীকালের বিশারদ হয়ে ওঠে।

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক